দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

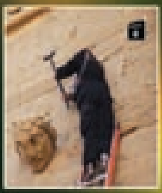

ধর্মীয় মৌলবাদ : সন্ত্রাস ও খলিফা সাম্রাজ্য

— পৃঃ ১১

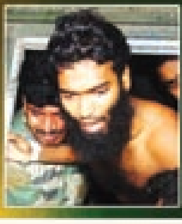

পশ্চিমবঙ্গ কি পুনরায় ধর্মভিত্তিক বিভাজনের দোরগোড়ায় ?

— পৃঃ ১৪

৬৭ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা।। ১৭ আগস্ট ২০১৫।। ৩১ শ্রাবণ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

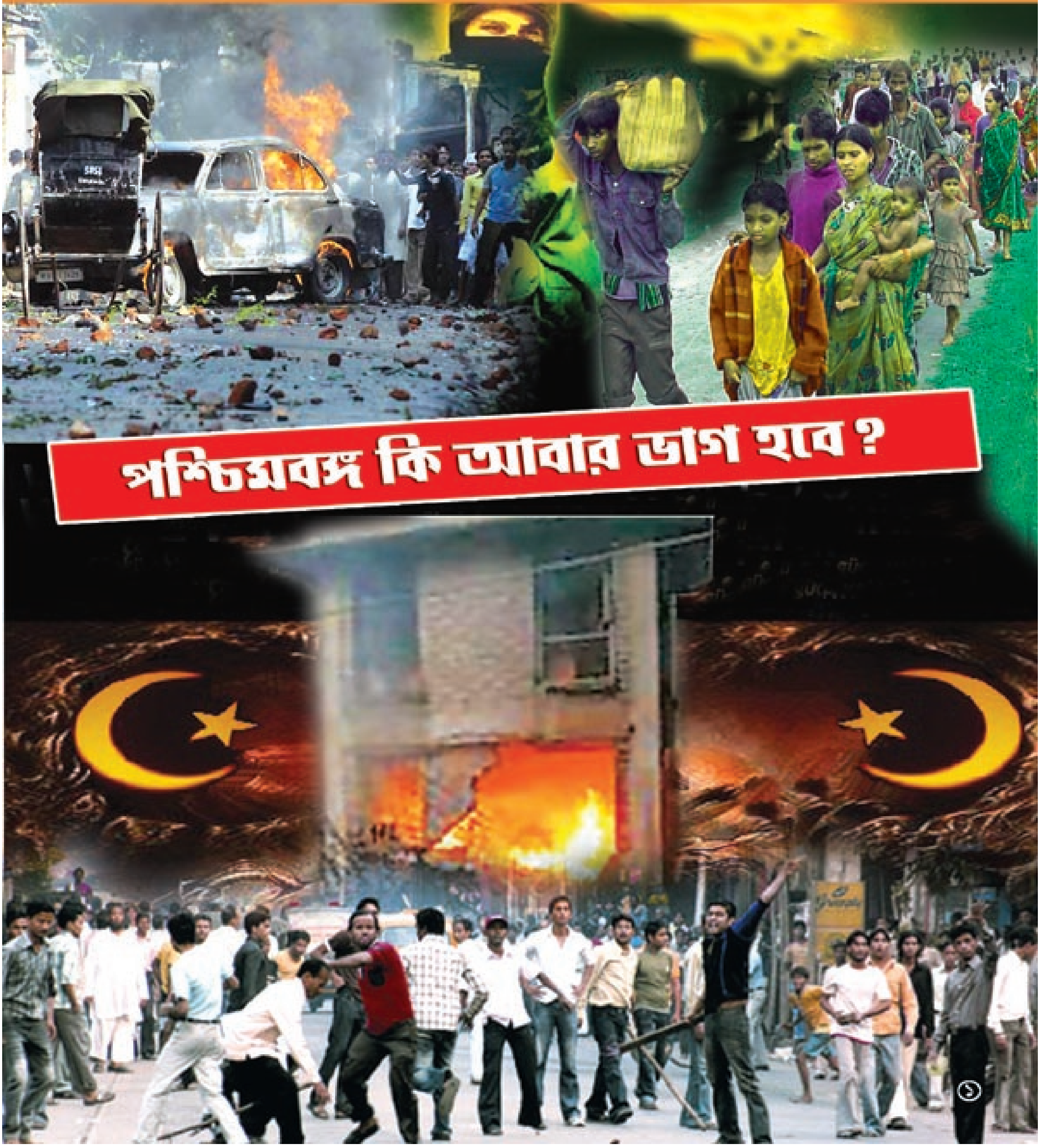

পশ্চিমবঙ্গ কি আবার ভাগ হবে ?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৫১ সংখ্যা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১৭ আগস্ট - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

খোলা চিঠি : কপিল ফেল, নো-বেল, মদনের জেল
□ সুন্দর মৌলিক □ ১০

ধর্মীয় মৌলবাদ : সন্ত্রাস ও খলিপা সাম্রাজ্য
□ ড. বাণীপদ সাহা □ ১১

পশ্চিমবঙ্গ কি পুনরায় ধর্মভিত্তিক বিভাজনের দোরগোড়ায়
□ বিমল প্রামাণিক ও পূর্ণিমা নস্কর □ ১৪

আইসিস-কে স্বাগত জানাতে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি
□ মোহিত রায় □ ১৭

ঐতিহাসিক রাজবংশ চোল : ভারত ইতিহাসে রাজেন্দ্র চোলের ন্যায় দ্বিগ্বিজয়ী বিরল□ গোপাল চক্রবর্তী □ ২১

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অনন্যতা □ রথীন সেনগুপ্ত □ ২৩

পাকিস্তানের সঙ্গে মোকাবিলার পন্থা □ মনোজ যোশী □ ২৭

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরানের পরমাণু শান্তি চুক্তির সাফল্য অন্য রাষ্ট্রগুলির উপর নির্ভরশীল
□ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ) □ ২৯

রাজ্যের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন্তর্জলির পথে
□ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ৩১

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা □ অমলেশ মিশ্র □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □

অন্যরকম : ৩৩ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮

□ রঙ্গম : ৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ চিত্রকথা : ৪১ □

প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সংস্কৃত দিবস

রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন হলেও সংস্কৃত নিয়ে সরকারের মনোভাবের এখনও কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রমে সংস্কৃত এখনও ব্রাত্য। অন্যদিকে সংস্কৃতভারতী পরিচালিত সংস্কৃত শিক্ষণে রাজ্যের যুবসম্প্রদায়ের আগ্রহ বাড়ছে। সংস্কৃতভারতী-র হাত ধরে সংস্কৃত শিক্ষণ বিষয়ে এক নতুন আন্দোলনের সূচনা হয়েছে এই রাজ্যে। সরকারিভাবে কলকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চললেও পশ্চিমবঙ্গের জেলার সরকারি সংস্কৃত কলেজগুলি আজ ধ্বংসের পথে। এই দ্বিচারিতা কেন? এসব নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ। লিখেছেন— নবকুমার ভট্টাচার্য ও প্রণব কুমার নন্দ।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নৈরাজ্য

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই বাংলার রাজনীতি ছিল প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের হাতে। কিন্তু স্বাধীনতার পর হইতেই অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হইল। সত্তরের দশক হইতে বাংলার রাজনীতিতে লুম্পেনদের প্রভাব শুরু হইল আর বাম রাজত্ব হইতে লুম্পেনদের জয়যাত্রা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। এখন তাহারা রাজনীতির সর্বত্র বিরাজমান। সাধারণ বাঙালি এই লুম্পেনদের বিদায় করিতে বামরাজত্বের অবসান ঘটাইল কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল না। যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই লুম্পেনদের বিদায় করিতে মরণপণ আন্দোলন করিয়াছিলেন, ক্ষমতা হাতে আসিবার পর তিনিই স্বয়ং রাজ্যে এই লুম্পেনদের নেত্রী হইয়া বসিলেন। তাই তাঁহার মুখে এখন শোনা যাইতেছে 'দুষ্টু ছেলের কাজ' 'ছোট ঘটনা' ইত্যাদি বাক্য। বাম রাজত্বে যে ঘটনাগুলি ঘটিলে তিনি চিলচিৎকারে রাজ্য মাথায় করিতেন সেই একই ঘটনায় এখন তিনি নিশ্চুপ। বহুদিন ধরিয়াই পশ্চিমবঙ্গে আমরা দুর্বৃত্তদের হিংস্রতা ও বর্বরতার মহোৎসব দেখিতে পাইতেছি। সভ্য সমাজে অন্যের অধিকারহরণকারী উৎপীড়কের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে এই রাজ্যে তাহা অকার্যকারী রহিয়া গিয়াছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতাসীন হইয়াই সশরীরে থানায় গিয়া গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তকে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করিবার বার্তায় যাহাতে কোনো অস্পষ্টতা না থাকে সেইজন্য পার্কস্ট্রিট হইতে কামদুনি, সাত্তোর পর্যন্ত অসংখ্যবার নিজের অবস্থান দলের দুর্বৃত্তদের দেখাইয়াছেন। স্বভাবতই তাহারা উল্লসিত, উৎসাহিত। আর পুলিশ! শাসকদলের পদসেবাই তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য। বামরাজত্বে পুলিশের যে ভূমিকা ছিল আজ অতিবাম তৃণমূলীরাজত্বে তাহাই রহিয়াছে। এই জন্যই নন্দীগ্রাম-সহ বিভিন্ন অপকর্মে দোষীপুলিশের শাস্তি হয় নাই, বরঞ্চ পদোন্নতি ঘটিয়াছে। বামরাজত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিনের উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যকে যেভাবে চরম অসম্মান অপমান নির্যাতন করা হইয়াছিল আজ প্রতিটি শিক্ষা প্রাঙ্গণে শিক্ষকদের প্রতি সেই একই ঘটনা ঘটিতেছে। শিক্ষায় অনিলায়নের পরিবর্তে মমতায়ন হইয়াছে। সর্বত্র গণতন্ত্রের নামে কায়েম হইয়াছে স্বৈরাচারী রাজত্ব। বামরাজত্বে যে চূড়ান্ত অধঃপতনের সূচনা হইয়াছিল আজ তাহা মহীরুহতে পরিণত। আমরা সত্যিই কী এমন পরিবর্তন আশা করিয়াছিলাম? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে আশা করিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিল তাহা নিরাশায় পর্যবসিত হইয়াছে। মা-মাটি-মানুষের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা হইতে পারে তাহা মানুষ পূর্বে কল্পনা করিতে পারে নাই। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পার্থক্য কিছুই নাই তাহা মানুষ আজ বুঝিতে পারিয়াছে।

বামরাজত্বের অত্যাচারের পাষাণ সরাইতে চৌত্রিশ বছর লাগিয়া গিয়াছিল। এই অত্যাচারী সরকারকে সরাইতে কত বছর লাগিবে তাহা রাজ্যের মানুষকেই স্থির করিতে হইবে। তবে এই নৈরাজ্যের অবসান করিতে চাহিলে আবার একটি রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটাইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, অত্যাচার করিয়া বামপন্থীরা রাজ্যে সাইনবোর্ডে পরিণতহইয়াছে, জ্যোতি বসুর মতো ব্যক্তিকেও ভুল করিয়া মানুষ আজ স্মরণ করে না। ভবিষ্যতে তৃণমূল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণতিও একই হইবে।

সুভাষিতম্

প্রত্যুত্থানং চ যুদ্ধং চ সংবিভাগং চ বন্ধুষু।
স্বয়মাক্রম্য ভুক্তং চ শিক্ষেচ্চত্বারি কুক্কুটাৎ।। (চাণক্য নীতি)

সঠিক সময়ে জাগরিত হওয়া, সদৈব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা, বন্ধুদের নিজের ভাগ দেওয়া এবং আক্রমক হয়ে ভোজন করা—এই চারটি গুণ মোরগের থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

আবার ইসলামি তাণ্ডব কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আবার ইসলামি তাণ্ডবের সাক্ষী হলো শহর কলকাতা। কর্মব্যস্ত একটি দিনে অবরুদ্ধ হয়ে রইলো গোটা শহর। ঘটনার সূত্রপাত গত ৩ আগস্ট দুপুর নাগাদ। এদিন শিয়ালদা স্টেশনে বৈধ পরিচয়পত্রহীন এক মৌলবি-সহ ৬২ জন কিশোরকে আটক করে রেল পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিয়ালদা স্টেশন চত্বর, রাজাবাজার ও পার্কসার্কাস এলাকায় বিক্ষোভ দেখাতে রাস্তায় নেমে পড়ে মুসলিম মৌলবাদীরা। ভাঙচুর চালায় বেশ কিছু দোকান ও কয়েকটি বাসে। অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয় স্টেশন সংলগ্ন

পাকিস্তানী পতাকা নিয়ে শিয়ালদহ-রাজাবাজারে পথ অবরোধ মুসলমানদের।

এর আগেও মৌলবাদীদের দাপটে কলকাতার স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে

- তসলিমা নাসরিনের বহিষ্কারের দাবিতে ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বর মুসলমানরা কলকাতার পার্কস্ট্রিট এলাকায় জনজীবন স্তব্ধ করে দেয়। বিক্ষোভের মোকাবিলায় সরকারকে সেনা নামাতে পর্যন্ত হয়েছিল।
- ২০১২-র মার্চ মাসে বাসে এক পথচারী পিষ্ট হলে স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ আসার আগেই উত্তেজিত জনতা চারটে বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।
- ২০১৪ সালের ৩০ নভেম্বর জামিয়াত উলেমা-ই- হিন্দ-এর নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর ডাকে শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিশাল সমাবেশ হয়। ওই সমাবেশেকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। পুলিশের উপর ইট নিক্ষেপ চলে। প্রায় ৮ জন পুলিশ জখম হন।

সবকটি রাস্তা। স্তব্ধ হয়ে যায় সমস্ত যান চলাচল। ভোগান্তির শিকার হন অসংখ্য অফিসযাত্রী-সহ দূরপাল্লার যাত্রীরা। তাদের এই বিক্ষোভ অবরোধ চলতে থাকে প্রায় গভীর রাত পর্যন্ত। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলেও তারা ছিল কার্যত নির্বিকার।

ঘটনার দিন দুপুর নাগাদ রেল পুলিশ শিয়ালদা স্টেশনে সন্দেহভাজন এক মৌলবি ও ৬২ জন কিশোরকে আটক করে তাদের কাছে পরিচয়পত্র দেখতে চায়। কিন্তু তারা কোনো বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে পারেনি। সঠিক ভাবে কিছু বলতে পারেনি সেই মৌলবি। তখন পুলিশ সেই কিশোরদের একটি হোমে পাঠিয়ে দেয়। সম্ভবত বিহারের কোনো মাদ্রাসা থেকে মহারাষ্ট্রের কোথাও পাঠানো হচ্ছিল সেই কিশোরদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়ায় শিয়ালদা স্টেশন চত্বর, রাজাবাজার ও পার্কসার্কাস এলাকায়। কয়েক হাজার মুসলমান মৌলবাদী পাকিস্তানি পতাকা হাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়ে রাজাবাজার থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত গোটা এলাকা। ফলে বন্ধ হয়ে যায় এপিসি রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড-সহ সমস্ত বড় রাস্তার যান চলাচল। শহরের ব্যস্ততম জায়গা হওয়ায় এর প্রভাব পড়ে গোটা শহরে। রাস্তায় আটকে পড়েন অসংখ্য অফিসযাত্রী- সহ সাধারণ মানুষ। স্টেশনে পৌঁছাতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হন বহু দূরপাল্লার যাত্রী। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যান উত্তর কলকাতার ডিসি শুভঙ্কর সিনহা-সহ কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের এই তাণ্ডব চললেও পুলিশকে কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতেই দেখা যায়।

কলকাতার বুকে ঘটে যাওয়া এতবড়ো ঘটনায় পুলিশ বা প্রশাসন কারো পক্ষ থেকেই কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এমনকী কোনো রাজনৈতিক দলও এবিষয়ে মন্তব্য করেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেবল

আটক হওয়া কিশোরদের সঠিক স্থানে পৌঁছে দেবার কথা বলেন। বিক্ষোভকারীদের সম্বন্ধে একটিও শব্দ খরচ করেননি। তবে ছোট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত বড়ো বিক্ষোভ অবরোধকে অনেকেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে মানতে পারছেন না। ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির পর কলকাতায় মুসলমানদের মধ্যে একটি চাপা ক্ষোভ ছিলই। এদিনের ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ বলে অনেকে মনে করছেন। বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী কলকাতার বিভিন্ন মসজিদ থেকে এদিনের এই পুরো ঘটনাটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। মূলত রাজাবাজার, পার্কসার্কাস ও খিদিরপুরের মসজিদগুলি থেকেই এর ইন্ধন আসছিল। সূত্রের খবর অনুযায়ী হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যই তাদের এই পেশী আস্ফালন।

ঘটনার দিন থেকে বিভিন্ন সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির মাধ্যমেও উত্তেজনা ছড়ানো হয়। ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপে ছড়িয়ে দেওয়া হয় উত্তেজনাকর হিন্দু বিরোধী মন্তব্য। গত কয়েক বছর যাবৎ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান মৌলবাদীদের আক্রমণের অনেক ঘটনা উঠে এসেছে। এদিনের ঘটনা দেখিয়ে দিল কলকাতা আর মোটেই নিরাপদ নয়। যে-কোনো সময় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে পারে রাজধানী। অনেকের মতে এই দিনটি যেন ছেচল্লিশের দাঙ্গার স্মৃতিকে আরও একবার উস্কে দিল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন —সহনশীল হিন্দুসমাজ মুসলমান মৌলবাদীদের এই তাণ্ডব বেশি দিন সহ্য করবে না। কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতাকে জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল করার কথা ভাবে তাহলে তারা ভুল করছে। এখানকার শান্তিপ্রিয় হিন্দু সমাজ তা কোনোদিন হতে দেবে না। প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত।

সংবাদ প্রতিবেদন

প্রসঙ্গ : ছিটমহল হস্তান্তর

হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে মানবাধিকার কমিশনের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের ভারতীয় ছিটমহলগুলির ভারতীয় বাসিন্দাদের ওপর ভীতিপ্রদর্শনের অভিযোগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নোটিশ পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক, অসম ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব এবং জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের জেলাশাসকদের। অভিযোগ এই বাসিন্দাদের অধিকাংশই জমি- ক্ষতিপূরণের গণনায় অন্তর্ভুক্ত হননি এবং মহিলাদের অপহরণ করে যৌন-হয়রানি করা হচ্ছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চার সপ্তাহের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে। কমিশন তার নোটে উল্লেখ করেছে, '১৯৭৪ সালে ভারত-বাংলাদেশ জমি-সীমা চুক্তি ও ২০১১ সালে জমি-সীমা চুক্তির আচরণবিধি কার্যকরী করার সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি'র জন্য বিনিময়-পত্রের মৌলিক বিষয় 'কর্মপদ্ধতি প্রয়োগে'র ব্যাপারটিকেই তাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন। অর্থাৎ দু'দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের যে চুক্তি হয়েছে তাতে বলা হচ্ছে, ছিটমহল বিনিময়ের পরে সেখানকার বাসিন্দাদের পছন্দ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এঁদের মধ্যে কেউ দেশ পরিবর্তন করতে চাইলে ভ্রমণ তথ্য- প্রমাণাদি এবং নিরাপত্তা দেওয়াটাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

গত ৬ জুন ভারতের বিদেশ সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ সচিবের ১ (৪) নং ধারার অন্তর্গত স্বাক্ষর করা চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, উভয় দেশের ছিটমহলের বাসিন্দাদেরই পূর্ণ অধিকার রয়েছে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি নিরাপদ প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার। প্রসঙ্গত, গত ২৯ মে দেশের ১০০তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে এই জমিসীমা চুক্তি কার্যকর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত অভিযোগ সত্য হলে তা যে শুধুমাত্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল হবে তাই নয়, উভয় দেশের চুক্তিও লঙ্ঘিত হবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি এবং ইন্ডিয়ান এনক্লেভস পিপলস কমিটি এই বিষয়টি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গোচরে আনে।

এঁদের পক্ষ থেকে করা অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ২০১১ এবং ২০১৫ সালে যে জনগণনা হয় তাতে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিটমহল কিংবা বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলগুলির বাসিন্দা অধিকাংশ ভারতীয়কে তার আওতায় আনা হয়নি। এরকম বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় ৩০, ০০০। এঁদের বক্তব্য, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে জমিসীমা চুক্তি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ক্ষতিপূরণ এঁরা পাননি। সুতরাং এঁদের জনগণনার আওতাভুক্ত করার নতুন পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে বলে সংগ্রাম কমিটি ও পিপলস কমিটি মনে করছে। এছাড়া বাংলাদেশের ভারতীয় ছিটমহলগুলির ভারতীয় বাসিন্দাদের তাদের মৌলিক সুবিধাগুলি থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বাংলাদেশি মাফিয়ারা হিন্দু মহিলাদের অপহরণ ও ধর্ষণ করছে। ছিটমহলের পুরুষদের একপ্রকার হুমকি দিয়ে তাদের স্ত্রী, কন্যা কিংবা বোনদের সেখানে রেখে তাদের ঘর-ছাড়া হতে বাধ্য করা হচ্ছে। ওই মহিলাদের একপ্রকার রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করছে মাফিয়ারা। রংপুর জেলায় হিন্দুদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে তাদের জমি, বাড়ি দখল করা হয়েছে। এমনকী জনগণনা কর্মীরা যখন এই ছিটমহলগুলিতে যান তখন তাঁদের সেখানে ঢুকতে পর্যন্ত বাধা দেওয়া হয় এবং এখানকার বাসিন্দাদের নাম গ্রহণেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়। এই পরিস্থিতিতে সংগ্রাম কমিটি ও পিপলস কমিটির দাবি অবিলম্বে নিরাপত্তা বাহিনী পাঠিয়ে এখানকার অত্যাচারিত বাসিন্দাদের উদ্ধার করা হোক এবং জমিসীমা চুক্তি অনুযায়ী এঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হোক। এই অভিযোগ দেশের প্রধানমন্ত্রী ও এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হলেও এখনও অবধি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে ওই দুই সংগঠনের পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে।

সংবাদ প্রতিবেদন

‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিয়ে হিন্দু সম্পত্তি দখল আওয়ামি লীগের মন্ত্রী, সাংসদ ও নেতাদের

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ মন্ত্রী, সাংসদ, ক্ষমতাসীন আওয়ামি লীগের নেতা-কর্মী ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ এনেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ। এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেয়াই ও সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোশাররফ হোসেন-সহ সরাসরি দখলবাজির সঙ্গে জড়িত সাংসদদের নাম উল্লেখ করেন ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ। এক লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা আপাতত নীরব থাকলেও শাসকদলের নেতা-কর্মীরা ‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিয়ে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল করছে কিংবা দখলের চেষ্টা করছে। তিনি কয়েকটি উদাহরণ টেনে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই ফরিদপুরে ভাজনডাঙ্গায় কয়েক কোটি টাকা মূল্যের ঐতিহাসিক জমিদারবাড়ি দখল করেছেন। সেখানে যে মন্দির ও আশ্রম ছিল তা এক রাতেই গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। সেই জমিদারের নাতি সতীশ চন্দ্র গুহ মজুমদারকে ভয় দেখিয়ে বায়নার কাগজে সই করতে বাধ্য করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন হিন্দু সমাজের ১৪ হাজার ৯'শ শতক সম্পত্তি ও বিভিন্ন স্থাপনা দখল করেছে ফরিদপুরে, এর মধ্যে বিরাট অংশ দেবোত্তর। ঠাকুরগাঁওয়ে বালিয়াডাঙ্গায় হিন্দু সমাজের জমি দখল করেছেন আওয়ামি লীগ সাংসদ দবিরুল ইসলাম। পিরোজপুরে স্বরূপকাঠিতে আওয়ামি লীগ সাংসদ এম এ আউয়াল এক হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকান দখল করার চেষ্টা করছেন। গাইবান্ধায় শাসকদলের সাংসদ ও হুইপ মাহবুর আরা গিনি রামগঞ্জ মিশন ও আশ্রমের জমি দখল করেছেন। লক্ষ্মীপুরে দালালবাজারে আওয়ামি লীগ নেতারা প্রশাসনের সহায়তায় তিন হাজার ৬ শ শতক দেবোত্তর ভূমি দখলের চেষ্টা করছেন। শত বছরের ঐতিহ্যবাহী জমিদারবাড়ি দখলের পাঁয়তারা চলছে। এছাড়া দেশজুড়ে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও বনবাসীদের সম্পত্তি জবলদখল তো রয়েছেই। ঐক্য পরিষদ নেতা প্রশ্ন করেছেন, এ দেশের সংখ্যালঘুরা যাবে কোথায়? ক্ষুব্ধ খোদ আওয়ামি লীগ সাংসদ, দলের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সুরজিত সেনগুপ্ত বলেছেন, ভোট নেওয়ার সময় ষোল আনা, দেবার বেলা এক আনা— তা আর হবে না। মানবাধিকার নেত্রী, সাবেক তদারকি সরকারের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল লক্ষ্মীপুরে দখলবাজি সরেজমিনে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমার সামনেই আওয়ামি লীগের নেতা-কর্মীরা জমিদারবাড়ি দখলের পক্ষে ‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিয়ে মিছিল করে। হিন্দু সম্পত্তি দখলের জন্যে ‘জয়বাংলা’ স্লোগান ব্যবহৃত হতে দেখে মর্মাহত হয়েছি।

গত ৫ আগস্ট সেগুনবাগিচায় সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ করার পর সারাদেশে এখন তোলপাড় হচ্ছে। এক সাংসদ তো অভিযোগ করে বলেছেন, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ বিএনপি-জামায়েতে ইসলামির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অর্থাৎ আওয়ামি লীগের বিরুদ্ধে বলা মানে বিএনপি-জামায়েতের পক্ষ নেয়া। মন্ত্রী সম্পত্তি দখলের গল্প তৈরি করেছেন এভাবে— জমিদারবাড়িটি বাঁচানোর জন্যেই তিনি সতীশ চন্দ্র গুহ মজুমদারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন। মন্ত্রী ফরিদপুরের হিন্দু নেতাদের হুমকি দিয়েছেন, যদি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কেউ করে তাকে দেশছাড়া করা হবে। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যাবেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর যখন বেয়াই।

ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিন্দু অধ্যুষিত ফরিদপুর জেলায় প্রশাসনের দেবোত্তর সম্পত্তি জবরদখলের কিছু তথ্য তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে : কালীমন্দিরের ১ হাজার ৮৬৯ শতক জমি দখল করেছে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ। শিবমন্দির ভেঙে তৈরি করা হয়েছে জেলা কারাগারের সাক্ষাৎকার কক্ষ। জগন্নাথ মন্দিরের ১ দশমিক ৩২ একর দেবোত্তর সম্পত্তি দখলে রেখেছেন জেলা প্রশাসক। ব্রাহ্মসমাজ মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বালিকা বিদ্যালয় ও শহীদ মিনার। পারিবারিক শিবমন্দির দখল করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আইন কলেজ। পারিবারিক দুর্গামন্দিরের ১ হাজার ৭২৫ শতক জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে সরকারি সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, নাটোরের সিংড়ায় মুক্তিযোদ্ধা ননীগোপাল কুণ্ডু ও তাঁর স্ত্রী চিত্রা রানিকে সম্পত্তি দখলের জন্যে হত্যা করা হয়েছে। হবিগঞ্জের মাধবপুরে কলেজছাত্রী শিল্পী রানিকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা ঊষাতন তালুকদার উপস্থিত ছিলেন। সুরজিত সেনগুপ্ত ঢাকায় ঐক্য পরিষদের এক সভায় বলেছেন, মন্ত্রী, সাংসদ, আওয়ামি লীগের নেতা-কর্মী ও প্রশাসনের এই দখলবাজির অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। এই অভিযোগ কার্যত সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতির স্লোগান দিয়ে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া এক ভয়ঙ্কর অপরাধ। এ থেকেই বুঝতে হবে, ভারতের সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানে কেন যায় না। কেন বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করে কেন? ▪

বন্যা নিয়ে রাজনীতি করছে রাজ্য সরকার

শুভাশিস রায় ॥ ১৯৭৮ সালে ভয়াবহ এক বন্যা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। তার ঠিক ৩৭ বছর পর প্রায় একই ছবি ধরা পড়ল বাংলা জুড়ে। উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি আরও খারাপ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১২টি জেলা বন্যা কবলিত। হাজার হাজার মানুষ বিপর্যস্ত। এমনই এক পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যার্তদের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে নিজের দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে তৎপর। রাজ্যের বানভাসি মানুষদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি করে বেড়াচ্ছেন বলে দাবি বিরোধী দলগুলির।

বন্যাকবলিত এলাকার মানুষদের পাশে গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দ নয়। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া প্রবল বর্ষণ এবং ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় এলাকায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দেখা যায় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে। এক্ষেত্রে তৃণমূলী সন্ত্রাসের মুখে পড়তে হয় বিজেপি নেত্রী রুপা গাঙ্গুলিকে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা জবাব দেন, সরকার ছাড়া অন্য কাউকে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করতে হবে না। এতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা না করে রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার এবং বর্ষীয়ান সিপিআই এম নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে রাজনীতি কখনই উচিত নয়।' মুখ্যমন্ত্রীর হুশিয়ারিতে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয় রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘও।

এখানেই ক্ষান্ত থাকেননি রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। গত ১ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'আমাদের গরিবের সংসার, ভিক্ষে করে ত্রাণ দেব। কেন্দ্রের কাছে হাত পাতব না।' এর পিছনেও ছিল রাজনীতির অন্য সমীকরণ। বন্যা কবলিত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সুযোগে কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই যে একাজ তার সরকার করেছে তা প্রচার করতেও সুবিধা হবে বলে ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু ৭২ ঘণ্টা যেতে না যেতেই নিজের সুর বদলে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যের ১২টি জেলার ২৩৩টি ব্লক, ৫৩টি পুরসভা, ১৬৩০৯টি গ্রাম বন্যা কবলিত। ক্ষতিগ্রস্ত ৬১ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৬৫ মানুষ। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি ১০৭৮০৮টি, আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি ৩৬৮২৩৮টি। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষিজমি ৭৯৭৮৪৮ হেক্টর। এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ৮৩ জন। সেইসঙ্গে মারা পড়েছে ১০ হাজার ৮৮টি গবাদি পশু। কিন্তু এই অবস্থার পরও কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো সংস্থা বন্যাকবলিত এলাকায় গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করলে তাদের বাধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। হাওড়া জেলার আমতা-উদয়নারায়ণপুর জলের তলায়। সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী বিলি করতে গেলে তৃণমূল কর্মীরা বাধা দেয়। অভিযোগ, বীরভূমের লাভপুরে রেডক্রস এবং রোটারি ক্লাবের মতো আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও ত্রাণ বিলিতে বাধা দিয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য 'বন্যা ত্রাণের জন্য চাঁদা তোলার যেমন দরকার নেই তেমনি অন্য কাউকে ত্রাণ বিলি করতে হবে না। যদি কেউ সাহায্য করতে চান তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা দিন।' কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ বন্যাদুর্গত মানুষদের কাছে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে? গত ৪ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সামনেই কল্যাণীর তৃণমূল বিধায়ককে সামনে পেয়ে শুধু গালমন্দই নয়, রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করলেন তাঁরই দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা। অপরদিকে অসন্তোষের মুখে পড়ে নামখানার তৃণমূল বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত মৌসুনি দ্বীপে ত্রাণশিবিরে গিয়ে বিপন্ন মানুষের বিক্ষোভের সামনে পড়ে জেরবার হতে দেখা যায়। আবার হাওড়ার আমতায় দমকলমন্ত্রী জাভেদ খান সরেজমিনে ত্রাণ বিলি পর্যবেক্ষণে গেলে স্থানীয় বিধায়ক সমীর পাঁজার উপস্থিতিতেই বন্যাকবলিত মানুষ বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, ত্রিপল হোক বা চিঁড়ে-গুড় কোনোটাই তাঁরা ঠিকঠাক পাচ্ছেন না। ডান-বাম বিচার না করে ব্লকে ব্লকে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করার প্রস্তাব নিয়ে গত ৮ আগস্ট নবান্নে সর্বদল বৈঠককে সরব হয় বিরোধীরা। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই ৯৯২ কোটি টাকার ত্রাণ বিলি করেছে সরকার। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, কোথায় এত টাকা খরচ হলো? এ প্রসঙ্গে বিরোধীরা মনে করেন, ১০০ কোটি টাকাও খরচ হয়নি।

রাজ্য বন্যাকবলিত হয়ে পড়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দায়ী করেছেন ডিভিসিকে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজ্যে ভারী বর্ষণ এবং ভরা কোটাল একসঙ্গে মিলে বিপদ বেড়েছে বলে স্বীকার করেছিলেন তিনি। এবার ভোল পাল্টে দোষ চাপালেন ডিভিসির ঘাড়ে। কিন্তু বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন বাংলার বন্যাকে 'ম্যান মেড' বলে আখ্যা দিতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই আজ যখন তাঁকে জবাব দিতে হচ্ছে সরকারের একের পর এক গাফিলতি প্রসঙ্গে তখন তাঁর গলায় শোনা যাচ্ছে অন্য সুর। আর বন্যা নিয়ে রাজনীতি করতেও পিছপা হচ্ছেন না জনদরদি নেত্রী। ■

কপিল ফেল, নো-বেল, মদনের জেল

মদন দা,

আপনার জন্য এক রাশ সহানুভূতি জানালাম। জানি আপনি এখন আর রাগ করার জায়গায় নেই তাই আর মাননীয়-টাননীয় সম্বোধনে গেলাম না। তাছাড়া আমি তো আর মন্ত্রী মদন মিত্রকে চিঠি লিখছি না। চিঠি লিখছি বন্দি মদনকে।

হাসপাতালেই থাকুন আর জেলেই থাকুন, দিদির কোলে আর জায়গা নেই। আপনি এখন দিদির ব্রাত্য ভাই। পরিচয়ই দেন না। দিদির মুখে কতদিন 'মদন' নামটাই শুনিনি। মন্ত্রিত্বটা আপনার রয়ে গেছে শুধু দিদির নিজের মুখ রক্ষার জন্য। এবার ওটুকুও কেড়ে নেবে। আর মাত্র ক'টা দিন।

যার জন্য তোলা তুলে আপনি জেলে সেই যখন নতুন নতুন ভাইদের নিয়ে লন্ডন ঘুরছেন তখন নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। একজন টেমসের পাড়ে আর আপনি হাসপাতালের বেডে।

মদন দা, আমার তো মনে হয় এবার ভাইফোঁটার আগেই আপনার মন্ত্রী-ভাই নামটা কাটা পড়ে যাবে। এবার পুজোয় আপনি দিদির থেকে ফ্যাব ইন্ডিয়ার পাঞ্জাবিও পাচ্ছেন না। দাদা, জীবনে মনে হয় এই প্রথবার আপনি পুজোর কলকাতায় থেকেও থাকবেন না। মন খারাপ করবেন না। আপনার পুজোয় নতুন কর্তা বসে গেছে। আপনার তো আবার একটা পুজো নয়। সারদা, রোজভ্যালি, আইকোর যত চিটফান্ড তত পুজো। এক এক জায়গায় এক এক জন স্পনসর। এবার শুনছি সব পুজোগুলোই নতুন কর্তা খুঁজে নিয়েছে। তাও ওরা ঠিক করেছিল প্রতিটি প্যান্ডেল আপনার ছবি রাখবে। (মালা ছাড়াই)। তাও দিদি বারণ করে দিয়েছেন। আপনার অভিষেক ভাইপো মানে কালীঘাটের যুবরাজ বলেছেন, ছবি রাখলে সেই নেতাকেই...। বুঝতেই পারছেন, হাতি কাদায় পড়লে কী হাল হয়। আমার মতো ব্যাঙও লাথি মারে।

আপনার জামিনের আর্জি আগেও অনেকবার নাকচ হয়েছে। কখনও মেজাজ হারিয়েছেন, কখনও হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু অত পয়সার উকিল কপিল সিব্বালও ফেল! আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দিদিও চান আপনি বাইরে থাকুন। কী করবেন? জেল থেকে দিদিকে শারদ শুভেচ্ছা পাঠাবেন নাকি কুণাল ভাইয়ের সঙ্গে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদবেন?

ভাবা যায়, একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ মদন মিত্রর প্রবল প্রতাপ এখন হাওয়া হয়ে গেছে! অবস্থা এমনই যে, জামিন পেতে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে সাধারণের জীবনযাপন করতেও রাজি তিনি। আপনার দামি আইনজীবী সরাসরি একথা আদালতে বলেনও। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি।

বড় কোনো কারণ ছাড়াই দিনের পর দিন 'রাজার হাল'য়ে হাসপাতালে থেকেছেন আপনি। যতই দোষ করুন তবু মন্ত্রী বলে কথা। এর আগে আলিপুর আদালতে আনার সময়ে আপনার গাড়ির উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল। আপনার সমর্থকদের সামলাতে আদালত চত্বরে নামানো হয়েছিল পুলিশবাহিনী। আলিপুর কোর্ট থেকে ব্যাঙ্কশাল, সেখান থেকে হাইকোর্ট, যতবারই জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে, ততবারই কারণ হিসাবে তাঁর প্রভাবের উল্লেখ করেছে আদালত। প্রভাবশালী মন্ত্রী জামিন পেলে তদন্তে প্রভাব পড়বে, বার বার এই অভিযোগ করেছেন সিবিআইয়ের আইনজীবীরা। জামিন পেতে মরিয়া হয়ে আপনি দ্বারস্থ হয়েছিলেন হাইকোর্টের। তাঁর হয়ে সওয়াল করার জন্য উড়িয়ে এনেছেন দুঁদে আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলকে। যিনি আবার পয়সা পেলে নীতি-টিতির ধার ধারেন না। সিব্বলকে আনতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেও পিছপা হননি আপনি। শুনেছি দল আর পয়সা দিচ্ছে না। আপনার সব অ্যাকাউন্টও বন্ধ করে দিয়েছে সিবিআই। এত টাকা তারপর পেলেন কোথা থেকে? এক সময় বলা হত বাম আমলের পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী শূন্যেও মশারি টাঙাতে পারেন। এখন দেখছি ফুল আমলের পরিবহনমন্ত্রী তাঁর ওপর দিয়ে যান। একেই বলে প্রভাব। আর তার জন্যই এ বারেও সিবিআই হাইকোর্টে আনল সেই প্রভাবশালী প্রসঙ্গই।

তবে দাদা কান্নাকাটি করবেন না। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করবেন না। ওসব করলে শরীর ভেঙে যাবে। কথায় বলে জেল খাটা। খাটা যখন, খাটুনি তো আছেই। বরং পুজোটা হাসপাতালে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। কাছেই তো ভবানীপুর। ঢাকের আওয়াজ শোনা যাবে।

দিদি মনে হয় পাঠাবেন না। আমিই বরং পারলে একটা 'জাগো বাংলা' পুজো সংখ্যা দিয়ে আসার চেষ্টা করব। শুনেছি দিদি এবারও কভারে ছবি আঁকছেন। তৃণমূল দুর্গা। সঙ্গে লন্ডনের ভ্রমণ কাহিনি।

— **সুন্দর মৌলিক**

ধর্মীয় মৌলবাদ সন্ত্রাস ও খলিফা সাম্রাজ্য

ড. বাণীপদ সাহা

ইংল্যান্ড-সহ ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ধর্মের জিগির তুলে জেহাদি শক্তি, ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সুপরিকল্পিত হত্যা ও ধ্বংসলীলা বিশ্বাবাসীদের শঙ্কা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অজুহাতে ধর্মীয় উগ্রপন্থী তালিবানদের অসহিষ্ণুতা, নৃশংস অত্যাচার ও অবাধ হত্যালীলা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য এক দুঃস্বপ্ন। এভিন্ন ইসলাম ধর্মের পূর্ব প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজনীতি অনুসরণ করে খলিফা পদ (Caliph) ও খলিফার অধীনে ইসলাম সাম্রাজ্য (Caliphat) পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্রনায়কদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক ও সিরিয়ার বেশ কিছু ভূখণ্ড খলিফা শাসন ও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। খলিফা সাম্রাজ্য স্থাপনের ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণ কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও ধর্মগুরু শ্রদ্ধেয় হজরত মহম্মদ কোনো উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যাননি বা কোনো আইন কানুন লিপিবদ্ধ করেননি। কাজেই বিশৃঙ্খলা এড়াতে তৎকালীন নেতাগণ জমায়েত হয়ে আবু বকর নামে এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করেন। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল যে, সমগ্র মুসলমান জগৎ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বকে আনুগত্য জানাবে বা আনুগত্যে আবদ্ধ থাকবে, যাকে ঘোষণা করা হয়েছিল ইমাম অথবা খলিফা। আব্বাসিডস গোষ্ঠী নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অপর গোষ্ঠী ফতিমিদ ঈজিপ্টে প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরপশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেনের খলিফা স্বাধীনভাবে খলিফারাজ কায়েম করে। মোঙ্গলরা বাগদাদ আক্রমণ করে তৎকালীন খলিফাকে হত্যা করে। হিন্দুস্থানের সুলতান কতুবুদ্দিন মোবারক শাহ ও সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি খলিফা পদমর্যাদা দাবি করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খলিফার সংখ্যা একাধিক ছিল।

খলিফা প্রতিষ্ঠান বা খলিফা সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ আনুশাসনিক। সে কারণে খলিফার প্রতি মুসলমান রাষ্ট্রের আনুগত্য ইসলাম ধর্মের আইন দাবি করে। ইসলাম ধর্মে কোনোপ্রকার ধর্মযাজকের ভূমিকা নেই। খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপের মত খলিফা ইসলাম জগতের ধর্মগুরু নহেন। ইসলাম জগতে খলিফার কোনো বিশেষ স্থান নেই, Privileged position বা কোনো ধর্মীয় অথরিটি নেই। তবে সমাজের প্রধান হিসাবে খলিফাকে অনেক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিতে হয়। যাইহোক, খলিফা রাষ্ট্রের প্রধান। আইনের সঠিক ব্যবহার ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আই এস আই এস ইসলাম ধর্মান্ধ এক জেহাদি ও সন্ত্রাসবাদীদের দল। তাদের মগজে খলিফা শাসন ও খলিফা সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে। তারা হয়তো ভেবেছে, ইসলাম জগতের রাষ্ট্রগুরু ও ধর্মগুরু হয়ে

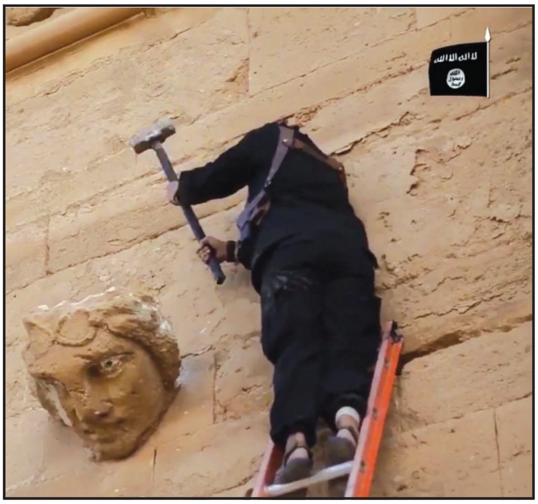

ইরাকের হাতরায় ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস করছে আই এস জঙ্গি।

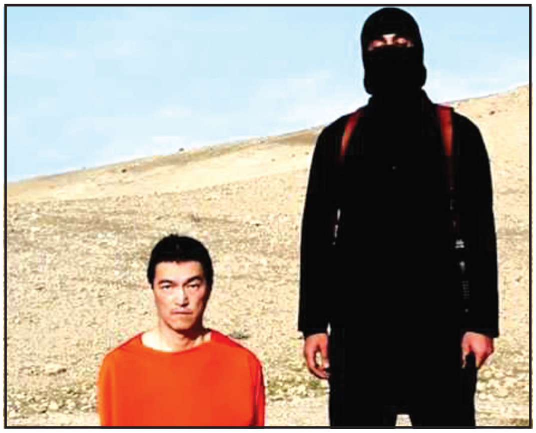

আই এস জঙ্গির কবলে জাপানি সাংবাদিক কেনজি গোটো। হত্যার পূর্বমুহূর্তের ছবি।

আই এস আই এস ইসলাম ধর্মান্ধ এক জেহাদি ও সন্ত্রাসবাদীদের দল। তাদের মগজে খলিফা শাসন ও খলিফা সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে। তারা হয়তো ভেবেছে, ইসলাম জগতের রাষ্ট্রগুরু ও ধর্মগুরু হয়ে খলিফা ইসলাম রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারবে।

খলিফা ইসলাম রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারবে। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য আরও শক্ত করে তুলতে সক্ষম হবে। খলিফা শাসিত সাম্রাজ্যে ইসলাম ধর্ম, শরিয়াত আইন ও কানুন রীতিনীতি দৃঢ়তা সহকারে প্রচলিত করা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, খলিফা রাষ্ট্রের প্রভাব ও শক্তহাত সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তার করা আরও সহজ ও সুদৃঢ় হবে। এ লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু সংখ্যক ইসলাম ধর্মের গোঁড়া ও মৌলবাদী নেতা খলিফা-রাজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে অর্থ, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করতে থাকে। ক্যাডার, সৈন্যদল, স্বেচ্ছাসেবক যোগাড় ও তাদের তালিমের বন্দোবস্ত করা হয়। তাৎপর্যপূর্ণ যে, বিশ্বের অনেক মুসলমান রাষ্ট্র এদের গোপনে সাহায্য করে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বহু রাষ্ট্রে একাধিক ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠী ও সংগঠন জেহাদকে জিইয়ে রাখতে অত্যন্ত সক্রিয়। এরা ইসলাম ধর্মের নির্দেশিত শাসন বলবত করতে বদ্ধপরিকর। ধ্বংস, হত্যালীলা, নাগরিক জীবন বিধ্বস্ত ইত্যাদির সাহায্যে ভয়, আতঙ্ক ও অহিংসার বাতাবরণ তৈরি এদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

গত বছর ইরাকের উত্তরাঞ্চলে আই এস আই এস-এর উদ্যোগে খলিফা-রাজ বা খলিফা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ঘনীভূত হয়। শীঘ্রই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিরিয়ায় জেহাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আই এস সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর প্রতিরোধ নস্যাৎ করে সিরিয়া ও ইরাকের কয়েকটি শহর ও ভূখণ্ড দখল করে বর্বর শাসন চালু করে। তুরস্কের উপর সরাসরি আঘাত না হানলেও তুরস্কবাসীরা গভীর আশঙ্কায় দিন কাটায়। যুদ্ধ ছাড়াও দূর থেকে বোমা বিস্ফোরণ, মানব বোমা ফাটিয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা ইত্যাদি আই এস সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান কৌশল। দ্বিতীয়ত, শিয়া মতাবলম্বী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরা এদের বিশেষ লক্ষ্য বা টারগেট। পরাজিত সৈন্যদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার, হত্যা, মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার, যৌনক্ষুধা চরিতার্থে তাদের ক্রীতদাসীরূপে ব্যবহারে সভ্য জগতের মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। জনমত ও নৃশংশতার দৃশ্য টিভি প্রচারের মাধ্যমে দেখে

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী কেমারন।

বিশ্বের জনগণ হতবাক হয়েছে। অন্ধ ধর্মীয় গোড়ামিপুষ্ট মৌলবাদ ও জেহাদি আন্দোলন যে কতটা ভয়ঙ্কর ও নারকীয় হতে পারে তারই নগ্নরূপ দেখে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনগণ শিউরে উঠেছে।

দুঃখের বিষয় যে, জেহাদের পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতা দেখেও এক শ্রেণীর মানুষ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এদের সমর্থন করছে এবং খলিফা-রাজ স্থাপনে এদের সাফল্য কামনা করছে। উল্লেখযোগ্য, আই এস সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা শুধু ইসলাম ধর্মের মানুষ বা মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী মানুষরা নয়। আশ্চর্যের বিষয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা ধর্মাবলম্বী স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা ইরাক ও সিরিয়ায় পাড়ি দিয়ে আই এস সন্ত্রাসে সামিল হয়েছে। ভারত থেকেও কিছু সংখ্যক যুবক জেহাদে অংশ নিয়েছে। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, সুদূর অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেসিয়া থেকে বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সন্ত্রাস যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক প্রমীলা রয়েছে। যুদ্ধে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে বিশ্বের নানা দেশ থেকে প্রায় কুড়ি হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা আই এস সন্ত্রাসে অংশ নিয়ে এ জেহাদ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে। মনে করা হচ্ছে, এরা অর্থের লোভে এ অন্যায় অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নিচ্ছে। এ যুক্তি আংশিক সত্য হলেও প্রকৃতপক্ষে অনেকে জেহাদের হাতছানিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শহিদ হওয়া পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করছে।

আই এস সংগঠন মধ্য-ইউরোপে এক শক্ত মাটি তৈরি করে ওই মহাদেশে সন্ত্রাস কার্যকলাপে জোরদার করতে উদ্যোগী হয়েছে। বসনিয়া রাজ্যে শহর থেকে দূরে পাহাড়ের উপরে ওসভি গ্রামে এক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে। জঙ্গিরা এ অঞ্চলের বা ওসভি গ্রামের আশেপাশে জমি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করছে। তিন বা চার মাস আগে ১২ জন জঙ্গিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে লড়াইয়ের জন্য ইরাক ও সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। এদের মধ্যে যুদ্ধে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। বসনিয়ার এ জায়গা ইউরোপে জেহাদি সন্ত্রাস চালানোর জন্য কৌশলগতভাবে খুবই উপযুক্ত। এখান থেকে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া ও ইরাকের উপর নজর রাখা খুবই সহজ। সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ ডেভিড গোলসেভিক বলেছেন, ওসভি গ্রাম থেকে বহু নাগরিক সিরিয়ায় পাড়ি দিয়েছে এবং এখনও নিয়মিত যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর ওসভি গ্রামটি এখনও মানচিত্রে স্থান পায়নি। যাতায়াতের রাস্তা নেই বললেই চলে। কুখ্যাত আই এস সন্ত্রাসবাদী মেচেয়েভিক সেখানে দুই হেক্টর জমি কিনেছে। দু'জন কুখ্যাত আই এস জেহাদি এখানে জমি কিনেছে। তারা এখন সিরিয়াতে যুদ্ধরত। এ অঞ্চলে ৪৩১ জন সন্দেহভাজন আই এস জেহাদি মসিজিদ, সরকারি অফিস, কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠান আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এরা সৌদি আরব, ইয়েমেন ও সিরিয়ার নাগরিক। সুরক্ষাবাহিনী ইতিমধ্যে ৬টি আত্মঘাতী আক্রমণের প্রস্তুতি নাকাম করেছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড কেমারন ইরাক

ও সিরিয়াতে ইসলাম ধর্মকে সম্বল করে সন্ত্রাসবাদ, আই এস সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করতে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। এর নাম 'Struggle of our generation'। এর প্রধান লক্ষ্য স্বদেশে তৈরি সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর হস্তে মোকাবিলা করা। বৃটেনে বসবাসকারী আধুনিক মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'শুধু মুখে প্রকাশ করা যে, ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের কোনো যোগসাজস নেই, মোটেই যথেষ্ট নয়। এ বিপদ শুধুমাত্র কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ব্যর্থতারই নামান্তর।'

ছেলেমেয়েদের ইরাক, সিরিয়া এবং সন্ত্রাসে আক্রান্ত দেশগুলিতে যাতায়াত বন্ধ করতে নতুন আইন পাশ করা হচ্ছে। এর ফলে পিতামাতা, অভিভাবকগণ সরাসরি পাশপোর্ট ফিরিয়ে নিয়ে ছেলেমেয়েদের যাত্রা বন্ধ করতে পারবে। তিনি বলেছেন, অসহিষ্ণুতা, পক্ষপাত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ভেদাভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ইসলামিয় সন্ত্রাসবাদ বেড়ে চলেছে। তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'জেহাদে অংশ নিয়ে তোমরা শুধু বুলেটের বা কামানের গোলার শিকার হবে।' আনন্দের বিষয় যে ধর্মীয় সন্ত্রাস দমনে বৃটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব শান্তিকামী জনগণের বুকে নতুন আশা জাগিয়েছে।

তুরস্ক, আই এস সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করতে গড়িমসির ফলে সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে সন্ত্রাসবাদীদের এলাকা দখল, সন্ত্রাস ও হত্যালীলা বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্মিলিত নেটো শক্তির বিমান আক্রমণ শানাতে তুরস্ক যথেষ্ট সহযোগিতা করছে না। এ অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। তুরস্কের সীমান্ত থেকে দশ কিলোমাইল দূরে সিরিয়ার শহর খুবানি। এখানে কুখ্যাত কুর্দিস সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। সিরিয়ার সরকারী সৈন্যদের হটিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা খুবানি শহরটি দখল করে ফেলে। তুরস্কপন্থী কুর্দিস ও সিরিয়ার বাহিনী প্রাণপণ যুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের হটিয়ে খুবানি শহরটি পুনর্দখল করে। পিছু হটার পূর্বে সন্ত্রাসবাদীরা বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক বস্তু, স্থাপত্য, ইরামত ধ্বংস করে যায়। এখনও শহরের আশেপাশে যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

গত ১০ জুলাই তুরস্কের শহর সুরুখ শহরে সন্ত্রাসবাদীদের আত্মঘাতী বোমায় ৩২ জন নাগরিকের মৃত্যু এবং প্রায় ১০০ জন আহত হয়েছে। সে সময়ে তুরস্কের কিছু প্রগতিশীল নাগরিক মিলিত হয়ে সিরিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর খোবানির পুনর্গঠনের জন্য আলোচনা শেষ করে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তখনই এক সাংঘাতিক বিস্ফোরণ ঘটে। নেটোর সভ্য হওয়া সত্ত্বেও তুরস্ক ইসলামিয় সন্ত্রাসী দমনে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' পন্থা অবলম্বন করে। আগাগোড়া নরম মনোভাব নেওয়ার নেটো শক্তির বিমান আক্রমণ আশানুরূপ হয়নি। তুরস্কের জনতা নরম নীতি গ্রহণের জন্য মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। কাজেই হঠাৎ বোমা ফাটিয়ে ৩২ জন নাগরিকের পৈশাচিক হত্যায় জনতার রোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও হিংসা জনজীবন স্তব্ধ করে দেয়। জনতা সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট আস সি এবডোগানকে সরাসরি দায়ী করে। তুরস্কবাসীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে রপ্ত। ইসলাম ধর্মের গোড়ামি থেকে তারা অনেকাংশে মুক্ত। কাজেই খলিফারাজ বা খলিফা সাম্রাজ্য মেনে নিতে তারা কোনোমতেই আগ্রহী নয়। আই এস, সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নরম নীতি, সীমান্ত রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা এবং যুদ্ধে অনুগত কুর্দদের পাশে না দাঁড়াবার জন্য প্রেসিডেন্টকে দায়ী করে। প্রতিবাদী জনতা রাজপথে স্লোগান দেয়, ''প্রেসিডেন্ট এবডোগান একজন খুনি।'' প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট ইসলাম ধর্মের গোড়ামির পৃষ্ঠপোষক। সহিষ্ণু ও প্রগতিশীল তুরস্কবাসী প্রেসিডেন্ট ও খলিফা-রাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার। যাইহোক, নতি স্বীকার করে সরকার সন্ত্রাস দমনে এখন অত্যন্ত তৎপর। রাজধানী আঙ্কারা, ইস্তামবুল ও অন্যান্য শহর থেকে ৩০০ সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইরাকের ভূখণ্ডে বিদ্রোহী কুর্দিশ ওয়ারকার পার্টি, পি কে কে-র ঘাঁটিগুলির উপর তুরস্কের যুদ্ধ বিমান সাতবার হানা দেয়। সিরিয়ায় সন্ত্রাসবাদীদের উপর বিমান আক্রমণ চলে। তুরস্কের মিলিটারি বিমান বন্দর Incirlik নেটোর বিমানবাহিনীর ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। তুরস্কবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও কঠোর মনোভাব, ইসলাম মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসবাদীদের খলিফারাজ স্থাপনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে ফেলবে, আশা করা যায়।

সৌদি আরব, ইয়েমন প্রভৃতি মুসলমান রাষ্ট্রগুলি খলিফা সাম্রাজ্য স্থাপনে বিরোধিতা করছে। হঠাৎ এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? কারণ, খলিফা, খলিফা সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক, মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সর্বপ্রধান ও সর্বেসর্বা। খলিফা মুসলমান রাষ্ট্রের আনুগত্য দাবি করবে। সে কারণে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রধানদের পদ খোয়ানোর সম্ভাবনা প্রবল। অতএব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে সকলের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

বিশ্বের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা মনে করে সমগ্র বিশ্বে খলিফারাজ কায়েম করে পৃথিবী শাসন করা তাদের হক। আজকে ইসলাম ও খৃষ্টান গোষ্ঠীর সংঘাত সহজভাবে গ্রহণ করলে জেহাদকে পরোক্ষ সমর্থন করা হবে। গির্জা আক্রমণ, ভাঙচুর ইত্যাদি পরোক্ষে জেহাদি সন্ত্রাসবাদের স্বার্থে কাজ করবে। এ অন্তর্নিহিত সত্য এবং এর ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করে বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষকে চলতে হবে।

(লেখক ওড়িশা পুলিশের প্রাক্তন ডি জি)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পশ্চিমবঙ্গ কি পুনরায় ধর্মভিত্তিক বিভাজনের দোরগোড়ায় ?

বিমল প্রামাণিক* ও পূর্ণিমা নস্কর**

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের প্রাক্কালে বঙ্গপ্রদেশের বৃহদংশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সেসকল অঞ্চল পাকিস্তান নামক ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ভারতের স্বাধীনতার ছয় দশক পেরিয়ে এসে আজ আবার পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই সকল পুরনো সঙ্কেত; জেলায় জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দাবি, এমনকী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাতেও কোনো কোনো বিশেষ অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাধিক্য থাকায় সেখানে বিশেষ আধিপত্য ও দাদাগিরির নানা ঘটনা খবরের কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে ও নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বামসরকার এবং বর্তমান তৃণমূল সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে মুসলমানদের একটা ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ধরে নিয়ে খোলাখুলিভাবে তোষণনীতি শুধু অব্যাহতই রাখে নাই, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধ প্রবণতার প্রতিরোধে চোখ বন্ধ করে থাকছে। ফলে মুসলমানাধিক্য অঞ্চলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বসবাস বহু জায়গায়ই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিশেষত হিন্দুদের তো বটেই। সাম্প্রতিককালে সংঘটিত ঘটনাবলীর কয়েকটি এখানে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হলো।

(১) গত ২৯ জানুয়ারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার উস্তি বাজারে দিনের বেলায় আশেপাশের গ্রাম থেকে সংগঠিত মুসলমানেরা হিন্দুদের পঞ্চাশটি দোকানে লুটপাট করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখতে থাকে, কারণ রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক এক মন্ত্রী অকুস্থলে দাঁড়িয়ে পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। কয়েকঘণ্টা ধরে শত শত মুসলমান জনতা লুটপাট ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে লুটের মালপত্র সমেত ধীরে ধীরে বাড়ি চলে যায়। প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলির সংবাদে এঘটনা তেমন গুরুত্বই পায়নি। দাঙ্গা ও লুটপাটকারীদের প্রকৃত পরিচয়ও কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেননি। এমনকী এ ঘটনা নিয়ে কোনো পুলিশি তদন্ত রিপোর্টও দেখা গেল না।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃত জঙ্গি হাফেজ মোল্লা। (ফাইল চিত্র)

(২) ২০১৩ সালে ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি যেভাবে প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে হিন্দু গ্রামগুলিতে দাঙ্গা সংঘটিত করা হয়েছিল, বাড়িঘর লুটপাট ও আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়েছিল— তা ২০১০ সালে বাম আমলে সংঘটিত উত্তর ২৪ পরগনার

ক্যানিং-এ নলিয়াখালিতে দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবারগুলির পাশে বিজেপি নেতা তথাগত রায়। (ফাইল চিত্র)

দেগঙ্গার দাঙ্গাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানেও ভুক্তভোগীরা এ ব্যাপারে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দিকেই আঙুল তুলেছিল। ক্যানিংয়ে মুসলমানদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মসজিদের একজন ইমাম খুন হওয়াকে উপলক্ষ করে পরিকল্পিতভাবে দুই শতের বেশি হিন্দুর বাড়িঘর লুটপাট ও পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। শতাধিক মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করা হয়। আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে যখন মুসলমানরা হিন্দুগ্রামগুলি আক্রমণ করছিল তখন বারবার পুলিশের সাহায্য চাইলেও পুলিশ নিরুত্তর থাকে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানায় প্রশাসন এবং পুলিশ দাঙ্গাকারীদের পক্ষেই ছিল। আরো ছোট ছোট অসংখ্য মুসলমান আগ্রাসনের ঘটনা বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে ঘটে চলেছে এবং তার কিছু কিছু সংবাদ পত্রপত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মুসলমানাধিক্য অঞ্চলেও হিন্দুদের অবস্থাও তথৈবচ। হিন্দু মেয়েদের অপহরণ, ধর্ষণ এবং পাচার একটা বড় সমস্যা। থানায় গেলে কোনো মামলা নেয় না, প্রশাসনের সাহায্য-সহযোগিতা খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই মেয়েদের উদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

গত জুলাই ২০১৫ ঈদের পূর্বে নদীয়া জেলার হোগলবেড়িয়া থানাধীন বাউসমারি, মধুগাড়ি, কাছারিপাড়া, স্বরূপপাড়া, চামনা, জয়রামপুর, হরেকৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিরাতে এক থেকে দেড় হাজার গোরু বাংলাদেশে পাচার করা হয়। এতে স্থানীয় কৃষকদের পাটক্ষেত, পটলক্ষেত, উচ্ছেক্ষেত, লঙ্কাক্ষেত-সহ প্রায় দুইশত একর জমির ফসল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা। কৃষকরা থানায় গো-পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলেও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব থানার কর্মকর্তাকে মামলা নিতে নিষেধ করে এবং জানায় কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে এ বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা হবে। মাত্র কয়েকজন মোড়লকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। বি এস এফ, পুলিশ, পঞ্চায়েত এবং শাসকদল--- সবাইকে বখড়া না দিয়ে তো গোরুপাচারের ব্যবসা করা সম্ভব হয় না, ফলে মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদের সভায় মাত্র কয়েকদিন আগে গোরুপাচার বন্ধে পার্টি এবং প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে বললেও তাতে কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুধু 'কথার কথাই' থেকে যাচ্ছে। কারণ খুবই স্পষ্ট। তৃণমূলের সব মিটিং এবং জনসভায় এই চোরাচালানকারীরাই তো অর্থ যোগায়। গত ২১ জুলাই এর জনসভায়ও তো তাদের বড় অবদান রয়েছে, স্থানীয় মানুষের তো এটা অজানা নয়। হোগলবেড়িয়া থানার বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই সেখানেই গোরু চোরাচালান সবচেয়ে বেশি। প্রতি রাতে পাচার হওয়া এক-দেড় হাজার গোরুর মূল্য আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা। এত বড় টাকার ব্যবসায় কী কোনো নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ মেনে আমাদের বর্তমান সমাজে কাজ করা সম্ভব! পুলিশ, বি এস এফ, প্রশাসন, জনতা--- সব এক কাতারে। তদুপরি বাংলাদেশের মুসলমান ভাইদের ঈদ, এতে আমাদের সরকার বা প্রশাসনের কী কোনো দায়িত্ব কর্তব্য নেই! নীরদ চন্দ্র চৌধুরির কথাই স্মরণ করে বলতে চাই 'হিন্দু বাঙালি সত্যিই আত্মঘাতী'। অবশ্য বাংলাদেশের মুসলমান বাঙালিদেরও এ থেকে আলাদা করে ভাবার কোনো কারণ দেখি না। যারা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান স্থপতি ও নেতৃস্থানীয়দের স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে তারা তো আরো বড় আত্মঘাতী।

দেশ বিভাগের পর ১৯৫১ সালের প্রথম জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যার অংশ ছিল ১৯.৮৫ শতাংশ।

বর্তমানে ২০১১ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ২৭ শতাংশ। কয়েকটি জেলায় ৫০-৬৩ শতাংশেরও অধিক। অন্যদিকে পূর্বপাকিস্তান তথা বাংলাদেশে ১৯৫১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ২২ শতাংশ থাকলেও ২০১১ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৮.৪ শতাংশ। বর্তমানে (২০১৪) ৮ শতাংশে এসে ঠেকেছে। এসকল তথ্য সবারই জানা। এতে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কোন দিকে ধাবিত

দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তিতে মৌলবাদীদের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত দোকান।

হচ্ছে— তা কি আমাদের রাজনৈতিক হর্তাকর্তারা বুঝতে পারছেন না? এতদসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের শাসককুলের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ ও বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের নিরাপদ আশ্রয়দান দেখে একটা প্রশ্নই বারবার আমাকে তাড়া করে বেড়ায় তাহলো, ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তর বাঙালি মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের যে আলামত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং ষড়যন্ত্রের আভাস ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে, সেখানে এদের ভূমিকা কী? যেহেতু বামসরকার হটিয়ে তৃণমূলের ক্ষমতা দখলের পিছনে যে মুসলমানদের একটা বড় অবদান রয়েছে অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যায় মুসলমানভোট তৃণমূলের পক্ষেই পড়েছে একথা তো মমতা ব্যানার্জী ভালোভাবেই জানেন এবং ২০১৬ সালের নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতা দখলে রাখতে হলে মুসলমান ভোট ছাড়া যে তা হবে না একথাও তিনি জানেন। ফলে মুসলমান তোষণ করে কার্যোদ্ধার করার পথই তার সামনে সঠিক পথ বলে মনে হচ্ছে। পূর্ববর্তী বাম সরকারও এই বিপজ্জনক পথই বেছে নিয়েছিল। এ কাজের সুদূরপ্রসারী বিষফল পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদেরই ভোগ করতে হবে।

রাজ্যে ২৭ শতাংশ মুসলমান হলেও সীমান্ত জেলাগুলিতে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তার অনেক জায়গায়ই বকলমে ইসলামি শাসন (শরিয়তি) কায়েম হয়েছে। প্রশাসনের সেদিকে নজর দেওয়ার সময় নেই অথবা নজর দেওয়ার নির্দেশ নেই। যেখানে মুখ্যমন্ত্রীই হেজাব পড়ে নমাজের কাতারে বসেন বা ইফতার পার্টিতে সদলবলে মুসলমানি কায়দায় যোগদান করেন, সেখানে তাঁর প্রশাসনের কতটুকুই বা করবার ক্ষমতা থাকে। 'ঈদের মাঠে মমতা ব্যানার্জীর উপস্থিতি ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন বাংলাদেশের শীর্ষ আলেমরা। আলেমরা মতামতে জানিয়েছেন, ইসলামের অন্যতম বিধান ঈদের, নামাজের প্রতি মমতা ব্যানার্জীর শ্রদ্ধাভক্তি ইতিবাচক। তিনি মাঠে উপস্থিত হয়েছেন, শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন, স্বেচ্ছায় নামাজে অংশ নিয়ে থাকলেও বাধা নেই ইসলামে।' বাংলাদেশের ইসলামি ধর্মবেত্তাগণ ইসলামের প্রতি মমতা ব্যানার্জীর আচরণ ও নিষ্ঠা দেখে তাঁর ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন।

বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণের ঘটনা তো সবারই জানা। তৃণমূল দল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে আধিপত্য দখলের পর বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশি ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় ও সাহায্যে অনেকগুলি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় মুসলমানরা জমি দেওয়া ছাড়াও নানাভাবে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে তৃণমূল দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন মাদ্রাসায় যেভাবে পুরুষ ও মহিলাদের জেহাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের জ্ঞান ও ব্যবহার সম্পর্কে তাদের পোক্ত করে সন্ত্রাসী কাজকর্মে জুড়ে দেওয়া হচ্ছিল— তা ভাবতে আমাদের অবাক লাগে! গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার ফলেই হয়তো আমরা অবাক হই। কিন্তু আমাদের পড়শি ইসলামি দেশগুলির দিকে একটু তাকিয়ে দেখলে এগুলি মোটেই নতুন লাগবে না। আজকের দিনে ইসলামি/মুসলিম দেশগুলিতে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদ গেড়ে বসেছে। বিশ্বে এটা একটা বড় সমস্যা। কিন্তু ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনীতি সচেতন-প্রগতিশীল একটি রাজ্যে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক সন্ত্রাসী সংগঠনের বাড়বাড়ন্ত কীভাবে মেনে নেওয়া যায়! পুলিশ এবং প্রশাসনের নাকের ডগায় নানা ডেরা তৈরি করে গ্রেনেড, বোমাসহ নানারকম বিস্ফোরক তৈরি হতে থাকে। তার একটা অংশ বাংলাদেশে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে ব্যবহার করা হতে থাকে এবং বাকি অংশ শাসক রাজনৈতিক দলের ভাণ্ডারে জমা হতে থাকে। এন আই এ তদন্ত না হলে একথা হয়তো জানাই যেতো না! তৃণমূল সরকার এতবড় ঘটনাকে ছোটখাটো ঘটনা বলে প্রচার করায় জনমনে সন্দেহ আরো দানা বেঁধেছে।

এসব দেখে এমন ধারণা তৈরি হতেই পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ আবার ধর্মীয় বিভাজনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর প্রতিকার কী? পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কোনদিকে ধাবমান?

** লেখক ডাইরেক্টর, সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দোবাংলাদেশ রিলেসনস্, কলকাতা।*

*** লেখক রিসার্চ স্কলার, এম এ. এম. ফিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।*

আইসিস-কে স্বাগত জানাতে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি

মোহিত রায়

আইসিস-কে স্বাগত জানাতে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি। আইসিস একটি সুন্নি ইসলামি মৌলবাদী হিংসাত্মক সংগঠন। এরকম একটি ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের একটি বড় অংশ স্বাগত জানাতে তৈরি— কথাটা অনেকের একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। সেকুলার বা বামপন্থীদের কথা ছেড়েই দিলাম, যাঁদের ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়বার কথা পশ্চিমবঙ্গে তাঁদেরও একটা বড় অংশ এ ব্যাপারে সেকুলারদের সঙ্গেই গলা মেলাবেন। কেউ বলে বসবেন সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না। কিন্তু কেন কথাটা বলা হলো? এটা কি স্রেফ একটা মুসলমান বিদ্বেষী অতিকথন? পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কি দেখা গেছে আইসিস-কে? এবার বলতে হয়— হ্যাঁ, দেখা গেছে। খুব বড় আকারে দেখা গেছে। দিনটি ছিল ৩০ মার্চ ২০১৩। পশ্চিমবঙ্গের হাজার পঁচিশ মুসলমান কলকাতার ময়দানে একত্র হয়েছিলেন সভা করতে। সে সভার বিষয় ছিল বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যাকারী জামাতে ইসলামের নেতাদের সমর্থন। এই গণহত্যাকারীদের প্রকাশ্য বিচার হচ্ছে বাংলাদেশের আদালতে। এই গণহত্যাকারীরা ইসলামের নামে পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে খুন করেছে বা পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা খুন করিয়েছে। এই হত্যার শিকারের বড় অংশ বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ। এই গণহত্যাকারীদের একের পর এক ফাঁসির আদেশ হচ্ছে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য বিশেষ আদালতে। এই কুখ্যাতদের সমর্থনে কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে সভা করেছে ইসলামি মৌলবাদীরা। তারা সেখানে শেখ হাসিনার ফাঁসির পোস্টার ঝোলায়। এই সবই ঘটে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা শহরে। গণহত্যাকারীদের সমর্থনকারী এই জনতা আর আইসিস-এর তফাত কোথায়? এই জনতা চায় পাকিস্তানি সমাজ, ইসলামি শাসন। কলকাতা ময়দানে জমায়েত এই ইসলামি মৌলবাদীরাই অপেক্ষা করছে আইসিস-কে স্বাগত জানাতে। কারা এনেছিল এই জনতাকে, কাদের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠেছে আইসিস বাহিনী? এসব নিয়েই আলোচনা।

এবার আইসিস নিয়ে একটু কথা বলা যাক। আইসিস (Islamic State of Iraq & Syria) একটি কট্টরপন্থী সুন্নি সালাফি ইসলামি দল। এই দলের লক্ষ্য সারা পৃথিবীতে ইসলামের আদর্শে খলিফা-রাজ প্রতিষ্ঠা করা। খলিফা হচ্ছেন মুসলমানদের দ্বারা মনোনীত নেতা যিনি সারা পৃথিবীর মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা। তুরস্কের রাজারা ছিলেন শেষ খলিফা যাদের খলিফা-রাজ চলেছিল ১৩৬২ থেকে ১৯২৪ সাল--- সাড়ে পাঁচশো বছর। যদিও খলিফা-রাজ ভারতে কোনোদিন পৌঁছতে পারেনি কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে খলিফার আকর্ষণ ছিলই। ১৯২৪ সালে তুরস্কে কামাল আতার্তুক খলিফা প্রথার অবসান ঘটালে ভারতীয় মুসলমানরা তার বিরোধিতায় এখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এই সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আন্দোলনে কংগ্রেসকে জড়িয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে পাকাপাকি ইসলাম তোষণের রাজনীতি শুরু করেন মোহনদাস গান্ধী। আইসিস আবার সেই খলিফা-রাজের স্বপ্ন নিয়ে এসেছে আর সঙ্গে এনেছে হত্যার বীভৎসতা। তারা খুন করছে শিয়াদের, খৃষ্টানদের, কুর্দদের। মেয়েদের বন্দী করে তাদের যৌনদাসী করে রাখছে। ধ্বংস করছে চার্চ, শিয়া মসজিদ। এসব তালিবানরাও করেছে। আইসিস সেটা করছে আরো কয়েকগুণ ভয়াবহতায়। এইসব বীভৎসতা সভ্য সমাজে শিহরণ আনলেও মুসলমান মানসে তা বিশেষ কোনো রেখাপাত করেনি। তালিবানি বীভৎসতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোথাও জোরালো বিরোধিতা দেখা যায়নি। বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার পরেও সারা পৃথিবীর বৌদ্ধ সমাজের কাছে কোনো ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। কেন? কারণ এই বীভৎস নরহত্যা, নারীকে যৌনদাসী বানানো, চার্চ বা বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করা— এসবই একেবারেই ইসলামসম্মত কাজ। ইসলামি ধর্ম পুস্তকাদি— কোরান হাদিসগুলিতে এইসব কাজের সমর্থন রয়েছে। ফলে মুসলমান সমাজ এসবে বিশেষ কোনো অন্যায় দেখতে পায় না। দেড় হাজার বছর আগের ইসলামের বিস্তারের ইতিহাস এরকমই ছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সুন্নি মুসলমানদের (এখানে শিয়ারা নেই বললেই চলে) তালিবান বা আইসিসকে সমর্থন না করার কোনো কারণ নেই। আবার প্রশ্ন উঠবে, সত্যি কি তারা এসব তালিবানি কাজ সমর্থন করছেন? এখন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের একেবারে প্রথম সারির নেতা হচ্ছেন কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম। কয়েক বছর আগেও এই ইমামদের গুরুত্ব ছিল ধর্মীয় ব্যাপারেই। এঁদের কিছু বিতর্কিত কাজ বা বক্তব্যকে ধর্মীয় গোঁড়া মনোভাবের প্রকাশ বলে অবহেলা করা যেত। এখন তা আর সম্ভব নয়। এখন টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম একজন গুরুতর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও বটে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতা পাবার আগের কয়েক বছর ও ক্ষমতায় আসার পর সব রাজনৈতিক মঞ্চে আসীন থাকেন তিনি। কিন্তু এটা শুধু একজন ইমামের ব্যাপার নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবার পর রাজ্যের কয়েক হাজার ইমামের হাতে রাজ্যের মুসলমানদের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন, এজন্য তিনি এইসব ধর্মীয় স্থানীয় নেতাদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা সরকারি কোষাগার থেকে করেছেন। অর্থাৎ

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের পকেটের পয়সা দিয়ে এমন কয়েক হাজার মানুষকে ভাতা দিচ্ছেন যাঁরা প্রতিদিন শেখায় আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য দেবতা হয় না, আল্লাহ-র কোনো শরিক নেই। এককথায় অন্য কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের কোনো স্থান ইসলামি মননে নেই। মমতা-পালিত এই ইমামরাই বর্ধমান শহরে ১৪ মার্চ ২০১৩-তে সভা করে বাংলাদেশের কুখ্যাত রাজাকার নেতা দেলোয়ার হোসেন সাইদির মুক্তি দাবি করে। আরেকবার ভাবুন, বাংলাদেশের একজন নেতা যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই, এমন একজন নেতা যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের মদতে মানুষজনকে খুন করার, যাকে ফাঁসির আদেশ শুনিয়েছে বাংলাদেশের আইনব্যবস্থা— এমন একজন গুণধর মুসলমানের জন্য বর্ধমানের ইমামরা রাস্তায় নেমে সভা করছেন। আইসিস বা তালিবান যেই আসুক, ইমামদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে এই ইসলামি দুর্বৃত্তদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত তা কি বলা অন্যায় হবে? এর পরেও কি কিছুটা ধোঁয়াশা থেকে গেল? এতটা বলাটা কি ঠিক হবে? তাহলে একেবারে শেষ সাক্ষীকে ডেকে আনা যাক। ২০১১ সালের ২ মে আমেরিকা সরকারের সেনারা পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া তালিবানের সর্বময় নেতা কুখ্যাত সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে। দুনিয়ার ইসলামি মৌলবাদীদের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের শীর্ষ নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চ আলো করা টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি সাহেব মৃত ওসামা বিন লাদেনের স্মরণে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করলেন। তিনি সরকারের বিশেষ মিত্র, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইমাম। সুতরাং সারা পশ্চিমবঙ্গের ইমামরা জেনে গেলেন যে ওসামা বিন লাদেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের এই ইমামরা যে বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী গণহত্যাকারীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে গলা ফাটাবেন তা তো স্বাভাবিক। সেজন্যই তালিবান বা আইসিস— তাদের বরণ করে নেবার জন্য ফুল চাদর নিয়ে অপেক্ষা করছে পশ্চিমবঙ্গ।

আইসিসকে বরণ করার জন্য জমি তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন বামপন্থীরা। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা একেবারে চুপ থাকতেন আর সুযোগ পেলেই হিন্দুত্ববাদীদের ঘাড়ে ঝাঁপাতেন। ইসলামি মৌলবাদীদের তুষ্ট করতে একেবারে চরম খেলটা দেখিয়েছিলেন সংস্কৃতিবান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি তসলিমা নাসরিনের বই নিষিদ্ধ করেন ও পরে তাঁকে এক কাপড়ে কলকাতা ছাড়াতে করেন। এই জমিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোনা ফলাচ্ছেন। কুখ্যাত সিমি-র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যকে বানিয়েছেন বাঙালির সাংসদ। ফলে রাজ্য জুড়ে চলছে ইসলামি শাসন। হিন্দু নারী ধর্ষণ, শরিয়তি আইন, যখন তখন বাস জ্বালানো, হাঙ্গামা লেগেই আছে। পুলিশকে কিছু করতে বারণ করা আছে। আইসিস এসে যা করবে তার অনেক কাজ এখনই চালু হয়ে গেছে। এর সর্বশেষে হলো কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী ইয়াবুক মেমনের ফাঁসির পর ইমাম বরকতি সাহেবের প্রার্থনা অনুষ্ঠান। আইসিসকে সমর্থন করার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের একটা অংশের কাছে সামান্যতম অজুহাত যথেষ্ট। জম্মুর একটি জায়গায় আইসিসের কাজের প্রতিবাদে তাদের পতাকা পোড়ানো হয়। ব্যাস, এবার স্থানীয় মুসলমানেরা প্রতিবাদে দাঙ্গা শুরু করে দিল। কারণ আইসিসের পতাকায় রয়েছে কোরানের বাণী— লা ইল্লাহা ইল্লালা, মহম্মদ রসুলাল্লা— একমাত্র আল্লাই ঈশ্বর আর মহম্মদ তার প্রতিনিধি। সুতরাং আইসিসের পতাকা মুসলমানেরা পোড়াতে দেবে না। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না— এ উৎকৃষ্ট ইসলামি উদাহরণ। কলকাতায় এর পুনরাবৃত্তি স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

আমরাও নিশ্চিন্তে বসে আছি আইসিস আসার অপেক্ষায়।

ইসলামি মৌলবাদীরা না হয় সরকারি মদত, আন্তর্জাতিক অর্থ ও অস্ত্রের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাদের কাজকর্ম চালাচ্ছে। কিন্তু বাকি সংখ্যাগুরু পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা কী করছেন? কিছুই না। এদের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন তাঁরা এসব নিয়ে তৃণমূলের থেকে খুব দূরে নয়। আর বামপন্থীরা তো গোঁসা করে বসে আছেন, কেন মৌলবাদীরা তাদের ছেড়ে তৃণমূলে গেল? কিন্তু এসবের বাইরেও থাকে এক বিশাল সমাজ পাকিস্তান-বাংলাদেশ থেকে ইসলামি হিংসার শিকার উদ্বাস্তু বাঙালিরা, মতুয়ারা। তারাও নীরব। হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের যাগযজ্ঞ কুম্ভমেলা নিয়েই আছে, তাদের সামাজিক দায়িত্ব বলে কিছু নেই। তাদের শুধু দায়িত্ব আপনাকে স্বর্গের ভিসাটি যোগাড় করে দেওয়া।

আর হিন্দুত্ববাদী পার্টিটি কি করছে? তারাও নিশ্চিন্ত। তারা কার কোন চিটফান্ডে টাকা গেল, বীরভূমে কোন দু'দল সমাজবিরোধী মারামারি করলো— এসব নিয়েই বেশি ব্যস্ত। এর মধ্যে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখাদেখি এই পার্টিও টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়ায় নাম লিখিয়েছে— একদল অভিনেত্রী নাকি এই পার্টি ও বাঙালির উদ্ধারে আবির্ভূত হয়ে গেছেন, এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। সুতরাং ভুলেও গত চার পাঁচ বছরে এরা ইসলামি মৌলবাদ কথাটি পর্যন্ত উচ্চারণ করে না। ইসলামি মৌলবাদীদের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের পরও এই পার্টির মিছিলের ব্যানারে লেখা ছিল কেবল উগ্রপন্থার বিরোধের কথা— তারা মাওবাদী না কামতাপুরি না ইসলামি—সে কথা কখনোই উচ্চারণযোগ্য নয়। মগরাহাটে টুকটুকি মণ্ডল মেয়েটিকে ছিনতাই করেছিল স্থানীয় মুসলমান যুবক, তার উদ্ধারে সেখানে ধরনা মঞ্চ বসিয়েছিল পার্টি। আর সেই মঞ্চ থেকে পার্টির সম্পাদক মণ্ডলীর একজন বরিষ্ঠ উদ্বাস্তু সদস্য ইসলাম যে কীভাবে দিকে দিকে শান্তির বাণী ছড়িয়েছে তার বিবরণ দিলেন অনেকক্ষণ ধরে।

আইসিস আপনার পাশেই অপেক্ষা করছে ও তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। হয় এখুনি রাজ্য জুড়ে ইসলামি প্রসারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করুন, নইলে দেখতে থাকুন বাঙালি হিন্দুর শেষ দিনগুলি। ■

চিঠিপত্র

‘যত মত তত পথ’

গত ১৩ জুলাই (২০১৫)-এর স্বস্তিকায় চিঠিপত্র বিভাগে শবরী ঘোষের একটি পত্রে পূর্বে প্রকাশিত প্রভাত কুমার মণ্ডল (৮.৬.২০১৫) মহাশয়ের একটি পত্রের বিরোধিতা করে বির্তকের সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত যত মত তত পথ বাক্যটি নিয়ে।

বিতর্কটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জানাবার ও জানবার প্রয়োজন আছে। প্রভাতবাবুই সঠিক কথা লিখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত গ্রন্থে কোথাও যত মত তত পথ কথাটি লেখা নেই। ওটি পরে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যরা ব্যবহার করতে শুরু করেন। যার জন্য কথামৃত ছাড়া মিশন দ্বারা ও অন্য ভক্তদের দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থে শবরী ঘোষ উক্তিটি খুঁজে পেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম জীবনে এমন কিছু বাক্য বলেছেন— যার সারমর্ম যত মত তত পথ। কিন্তু ইসলাম নিয়ে সাধনা করার পর পরহংসদেব তাঁর বাণী কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ করে বলেন— “হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যেসব ধর্ম দেখছ এসব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে, যাবে। থাকবে না।... হিন্দু ধর্ম বরাবর আছে বরাবর থাকবে।” শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথাটি তাঁর প্রয়াণের দুই বছর পূর্বে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর তারিখে প্রদান করেন।

কথামৃতের প্রথম খণ্ড ৭৯৪ পৃষ্ঠায় (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা প্রকাশিত) একথাটি রয়েছে। এরকম বলার কারণ হলো ইসলাম সাধনার সময় তাঁর মনে দেব বিরোধী তামসিক ও আসুরিক ভাবধারা চলে এসেছিল। তার থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেন যে ওটি সনাতন ধর্মের মতো চিরন্তন নয়। খুব বড় পণ্ডিতদেরও ভুল হয়। মিশনের যাঁরা “যত মত তত পথ” কথাটা প্রচার করছেন তাঁদের জন্য ইসলামের ভাবধারা সম্পর্কে সচেতন না হয়ে বহু হিন্দু উদাসীন হয়ে থাকছেন। এতে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের ক্ষতিই হচ্ছে।

—**রবীন সেনগুপ্ত,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

প্রথম স্থানের দিকে পশ্চিমবঙ্গ

Muslim k support korun. আর পশ্চিমবঙ্গকে প্রথম স্থানে নিয়ে আসুন। দেশের মধ্যে মুসলিম প্রধান রাজ্য হিসাবে কাশ্মীর প্রথম, অসম দ্বিতীয়, পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়। জাতীয় জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধি ১৮ শতাংশ, মুসলিম বৃদ্ধি ২৪ শতাংশ, আর পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি ৩৪ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ যে ক্রমশই প্রথম স্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে...

বাঙালি হিন্দুরা দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হওয়ার জন্য তৈরি থাকুন। এতদিনে বাঙ্গাল-ঘটির ঝগড়া মিটবে, কারণ এবার উভয়ে উদ্বাস্তু হতে চলেছে। কেন এ প্রশ্ন? শুনুন--- ২০১১ থেকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী, জঙ্গি, জামাতের স্বর্ণযুগ হোতে চলছে এই বাংলায়। ২০১৬-এর ভোটে তৃণমূলই জিতবে বাংলাদেশী জঙ্গি, জামাতের মদতদানকারী দল এবং ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটের সাহায্যে। অর্থাৎ এই ২০১১ থেকে ২০২১-এ এই দশ বছরে বাংলাদেশের জঙ্গি, জামাতের এবং বাংলাদেশীদের স্বর্ণযুগ হতে চলেছে। ১৯৪৭-এ এই বাংলায় সংখ্যালঘু ছিল ৫ শতাংশ, এখন ২০১৫-এ হয়েছে ৩০ শতাংশ। (বেসরকারি মতে ৩৮ শতাংশ)। ২০২১-এ হতে চলেছে ৪২ শতাংশ। এই ৪২ শতাংশ শক্তি নিয়ে তাঁরা ২০২১-এ নিজেদের দল গড়ে ভোটে লড়বে ও জিতবে, বাংলার মসনদে বসবে।

তারপর ধীরে ধীরে তাঁর ২৫ বছরের মধ্যে বাংলা থেকে হিন্দুদের মেরে কেটে বিতাড়িত করবে। শুধু হিন্দুশূন্য করাই নয়, রাইটার্সে বসে এই বাংলা যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে মিশে যায় তাঁর পরিকল্পনা করবে এবং ২০৪৭ সালে তা সফলভাবে কার্যকর করবে— যে পরিকল্পনা তারা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। সুতরাং আর দেরি কী? ২০১৬ ভোটটা নিশ্চিন্তে দিয়ে, ব্যাগপত্তর গুছিয়ে ফেলুন।

আপনারা তো আর রুখে দাঁড়াবেন না, পালাতে ওস্তাদ। বাঙালদের থেকে জেনে নিন, আর যাদের বাঙাল-এ অ্যালার্জি তারা কাশ্মীরিদের থেকে জেনে নিন। ধন্যবাদ। পারলে অন্যদের শেয়ার করে জানান। না পারলে আরও ভাল। কারণ হিন্দু তো ঘুমিয়ে থাকে, আপনিও ঘুমান।

—**বিমল দত্তগুপ্ত,**
স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

ইয়াকুবের ফাঁসি এবং ‘আফটার শক’

১৯৯৩ সালে মুম্বই শহরে পরপর ১৩টি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তিন শতাধিক মানুষ খুনে অভিযোগে দণ্ডিত ইয়াকুব মেমন। ইয়াকুবের ফাঁসির আগে পরে বহু আলোচনা, তক-বিতর্ক হয়েছে ও হচ্ছে। সেই আলোচনায় অংশ নিতেই আমার এই কলম ধরা। ভারতীয়রা ঝোলেও আছে, অম্বলেও আছে। যে কংগ্রেস আফজল, কাসভকে ফাঁসি দিয়ে নিজেকে দেশপ্রেমী প্রমাণ করেছিল, সেই কংগ্রেসই আজ মেমনের ফাঁসিতে কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করছে।

কথা হলো, মৃত্যুদণ্ডের বৈধতা আছে কি নেই। যুক্তিবাদীরা বলছেন, রাষ্ট্রের যখন প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা নেই তখন প্রাণ নেওয়ারও অধিকার নেই। কিংবা মৃত্যুদণ্ড দিয়েও কি অপরাধ কমছে? অনেক দেশ মৃত্যুদণ্ড রদ করে দিয়েছে, আমরা কেন পারি না? বহু বছর জেল খাটার পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি ঠিক? মৃত্যুদণ্ড এমন এক দণ্ড যার পুনর্বিবেচনা সম্ভব নয় ইত্যাদি আরো অনেক প্রশ্ন, যুক্তি।

ভারতীয় সংবিধানের চরম দণ্ড হলো ফাঁসি। মানবিকতা দেখিয়ে জেলখানা হয়েছে ‘সংশোধনাগার’। মানবিক কারণে ফাঁসির আদেশ নিয়েও সমালোচনা চলছে

দেশজুড়ে। তাই, উপরোক্ত যুক্তিজাল বুদ্ধিজীবী ভারতীয় নাগরিকের। প্রত্যেক ভারতীয় এবং শিক্ষিত নাগরিকের মৃত্যুদণ্ডের কারণ সম্পর্কিত ধারণা থাকা দরকার। আইনের কঠোর শাস্তির ভয়ে নাগরিকরা কেন সচেতন জীবনযাপন করবে না? আমরা তো জানি হেলমেট ছাড়া গাড়ি চালালে পুলিশ ধরবে, তবে কেন হেলমেট ব্যবহার করব না? বদলে পুলিশের ধরপাকড়কে অমানবিক বলব কেন? জানি আফজল গুরু, আজমল কাসভকে কেন ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে, তবু সেই পথে পা বাড়ান কেন?

যারা আজ পর্যন্ত ফাঁসির সাজা পেয়েছে, তাদের অপরাধ হটকারি ভাবনার ফসল নয়। বিশেষ করে দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত জঙ্গিদের উপর মানবিকতা দেখিয়ে মৃত্যুদণ্ড রদ করার অর্থ দেশের সমগ্র নাগরিকের প্রতি অমানবিকতা দেখানো নয় কী? এ বিষয়ে কি মত দেবেন শিক্ষিত সমাজ?

একজন দেশদ্রোহী, দেশ-শত্রুকে বাঁচানোর জন্যে অমানবিকতার দোহাই দিয়ে ইয়াকুব মেমনের মৃত্যু দণ্ড রদের জন্য একদল ভণ্ড নাগরিক টুইট করছেন, সই জোগাড় করছেন। ভাবলে গা শিউরে ওঠে। ভারত আজ কোন অন্ধকারে অবস্থান করছে। এমন কী মহান কাজ করেছে ইয়াকুব মেমন যে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ছবি মিডিয়া ফলাও করে প্রচার করবে? এমন দেশাত্মবোধহীন নাগরিকদের জন্যই তো ছোটা শাকিলদের এতো তর্জন গর্জন।

—**বরুণ মণ্ডল,**
রানাঘাট, নদীয়া।

শুধুই ম্যাগি?

ম্যাগি নিয়ে সারাদেশ উত্তাল। সারাদেশে ম্যাগি উৎপাদন ও বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যতিক্রম আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে থেকে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। জনসাধারণের উপর বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছেন। সরকারের নৈতিক দায়িত্ব থাকে বাজারে যেসব খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রি হয় তার গুণগত মান যাচাই করা। সেই সব খাদ্য গ্রহণে শরীরের কোনো ক্ষতি হবে কিনা তা দেখার। বর্তমান সরকার সে দায়িত্ব পালন করছেন না। এখানেও রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করছে। আমরা যেসব প্রতিনিয়ত খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি যেমন— চাল, ডাল, সব্জী, মাছ, মাংস, ডিম, এসব খাদ্য শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। কৃষক অধিক ফসল ফলানোর জন্য অধিকমাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে থাকে। পোকা-মাকড় মারা যাক বা না যাক কীটনাশক ওষুধ যথেচ্ছ প্রয়োগ করা হয়।

অপ্রত্যক্ষভাবে ওইসব রাসায়নিক সার আমাদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। আমার এক সময় আবাদি জমি ছিল, জমিতে উৎপাদিত সব্জী কয়েকদিন ঘরে তুলে রাখলে শুকিয়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু পচন দেখিনি। অসুস্থ হলে ডাক্তারের নির্দেশ মতো ওষুধ খেতে হচ্ছে। বিদেশে যে সব ওষুধ নিষিদ্ধ, সেই সব ওষুধ আমাদের দেশে দিব্যি ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলেও নতুন নতুন রোগ হচ্ছে।

ম্যাগি ছাড়াও বাজারে প্রচুর প্যাকেটজাত খাদ্য বিক্রি হচ্ছে। নুডলস্ চাউমিন, চাউচাউ, রং মেশানো মিষ্টি, ফুটপাতে নানাপ্রকার রং মেশানো খাবার বিক্রি হচ্ছে। এসব খাদ্য গুণগত দিক থেকে ও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা দেখার কেউ নেই। খাদ্য ও স্বাস্থ্য দপ্তর রয়েছে তবু দেখার লোক নেই। মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও বহুদিন তাজা রাখার জন্য এক ধরনের ওষুধ ব্যবহার বা রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়। অন্ধ্রের মাছ রান্নার পরও দুর্গন্ধে খাওয়া যায় না।

ম্যাগি পরীক্ষায় সিসা পাওয়া গিয়েছে। সিসা কখনই খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। সিসা শরীরের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকারক। নেসলে-সহ অন্য সব কোম্পানি দীর্ঘকাল থেকে কীভাবে আমাদের দেশে ব্যবসা করে আসছে? কে তাদের অনুমতি দিয়েছিল? অনুমতি দেওয়ার পূর্বে ওইসব খাদ্য দ্রব্যের গুণগতমান যাচাই করা হয়েছিল কি? ওইসব খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

এই সমস্ত বিষ মিশ্রিত খাদ্য থেকে জনসাধারণকে নিরস্ত করতে হলে ওইসব খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া, রং মেশানো মিষ্টি, আবাদি জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ করা। তবেই দেশের মানুষ সুস্থ ও নীরোগ জীবনযাপন করতে পারবে।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,**
নতুনপাড়া, কোচবিহার।

আনুড়ের বিশালাক্ষী মন্দির

'আনুড়ের বিশালাক্ষী মন্দির' শীর্ষক পত্রের (২০ জুলাই ২০১৫) পত্রলেখকদের ধন্যবাদ জানাই।

তাঁদের বক্তব্য প্রসঙ্গে জানাই কামারপুকুর কলেজ মোড় থেকে হাঁটা পথে আনুড় যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি সৌজন্যবশত তাঁর বাইকে আমাকে তুলে নেন এবং মা বিশালাক্ষীর মন্দিরে পৌঁছে দেন। বিনয় মুখার্জির উদ্যোগে মন্দিরের গড়ে ওঠার কথা তাঁর কাছেই শুনি।

যাই হোক ভুল ভুলই। তথ্যটি যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত এবং আনুড় গ্রামবাসী তথা পত্রলেখকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

—**উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল,**
শেওড়াফুলি, হুগলী।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা
প্রতিকপি ১০ টাকা

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন।

পরম্পরা

ঐতিহাসিক রাজবংশ চোল

ভারত ইতিহাসে রাজেন্দ্র চোলের ন্যায় দ্বিগ্বিজয়ী বিরল

গোপাল চক্রবর্তী

মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জাভুর ও তিরুচ্চিরাপল্লী অঞ্চলের চোল রাজবংশ অতি প্রাচীন। কাত্যায়নের কার্তিক (খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী) এবং অশোকের শিলালেখে (খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী) চোলগণের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন তামিল কিংবদন্তীতে চোলরাজ করিকলের নাম সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত চোল-রাজ্যের আয়তন অতি ক্ষুদ্র ছিল। সুদূর দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চির পল্লব বংশের আধিপত্যকালে চোলেরা পল্লব সম্রাটগণের সামন্ত বা লঘুমিত্র ছিলেন।

উত্তরকালীন চোল সম্রাট বংশের আদি পুরুষ বিজয়ালয় ৯ম শতাব্দীর ৩য় পাদে পল্লবরাজের সামন্তরূপে তিরুচ্চিরাপল্লীর নিকটবর্তী উরৈয়ূর থেকে রাজ্য

তিরুভাস্কর পঞ্চনাথেশ্বর মন্দির

শাসন করতেন। তিনি তাঞ্জাভুর অধিকার করেন। তাঁরা পুত্র আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খৃ.) পল্লবরাজ অপরাজিতের পক্ষে যুদ্ধ করে শ্রীপুরম্বিয়ম্ নামক স্থানের মহাযুদ্ধে পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করেন; কিন্তু ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অপরাজিতকে পরাজিত করে তিনি পল্লবরাজ্য অধিকার করলেন। এই ভাবে চোল-সাম্রাজ্যের পত্তন হলো।

আদিত্যের পুত্র পরান্তক (৯০৭-৫৭ খৃ.) সিংহলীয় সেনার সাহায্যপুষ্ট পাণ্ড্যরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে পাণ্ড্য-রাজধানী মদুরা অধিকার করেন। রাষ্ট্রকুটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ চোল-রাজ্য আক্রমণ করে বল্লাল (দক্ষিণ আর্কটের অন্তর্গত তিরুবল্লম্)-নামক স্থানে পরান্তকের হস্তে পরাজিত হন। কিন্তু শেষ জীবনে পরান্তক রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের আক্রমণ প্রতিরোধ করাতে অসমর্থ হন। তক্কোলমের যুদ্ধে চোলসেনাপতি যুবরাজ রাজাদিত্য নিহত হন এবং চোল সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে রাষ্ট্রকুট অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৬ খৃ.) এবং তৎপুত্র প্রথম রাজেন্দ্রের শাসনকাল (১০১২-৪৪ খৃ.) চোল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। রাজরাজ তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী সমগ্র ভূভাগে আধিপত্য সুদৃঢ় করেন। তাঁহার সময়ে বেঙ্গা ও কালিঙ্গরাজ্যে চোলপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিংহল দ্বীপের উত্তরাংশ চোল-সাম্রাজ্যের একটি

রাজেন্দ্র চোল

প্রদেশে পরিণত হয়। তিনি বহুবার তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরস্থিত উত্তরকালীন চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করেন। ১০১২ খৃষ্টাব্দে থেকে তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র তাকে রাজ্যশাসনে সহায়তা করছিলেন। তাঞ্জাভুরের বৃহদীশ্বর বা রাজরাজেশ্বরের মন্দির রাজরাজের অতুলনীয় কীর্তি। তিনি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতি মারবিজয়োত্তুঙ্গ বর্মাকে নাগপট্টনে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করতে সাহায্য করেছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে রাজেন্দ্রচোলের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বিরল। তিনি সমগ্র সিংহল দ্বীপে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর সেনাদল পূর্ব দিকে দক্ষিণ বাংলা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তাঁর লেখমালায় যে সকল পূর্বদেশীয় রাজার নামোল্লেখ দেখা যায়,

তন্মধ্যে যযাতি নগরের সোম বংশীয় নরপতি ইন্দ্ররথ, দণ্ডভুক্তিপতি ধর্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, বঙ্গদেশের গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ের অধিপতি পালবংশীয় প্রথম মহীপাল প্রসিদ্ধ। এই রূপে গঙ্গাতীর পর্যন্ত চোলপ্রভাব বিস্তার করে রাজেন্দ্র ‘গঙ্গৈকোণ্ড’ (গঙ্গাবিজয়ী) উপাধি ধারণ করেছিলেন। তাঁর নৌ-সেনা ভারত-মহাসাগরের মানক্কবারম্ (নিকোবর) দ্বীপ এবং মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চল-স্থিত বহু সংখ্যক জনপদ অধিকার করে। শৈলেন্দ্র বংশীয় সংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গ বর্মাকে পরাজিত করে তিনি কটাহ বা কড়ারম্ (পেনাভের নিকটবর্তী কেডা) এবং সুমাত্রার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত শ্রী বিজয় (বর্তমান পালেম্বং) অধিকার করেন। সম্ভবত নৌ-সেনার এই অভিযানের সহায়ক হিসাবেই রাজেন্দ্রের স্থলসৈন্য বাংলাদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।

পিতার ন্যায় রাজেন্দ্রও বহুবার চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। চালুক্যরাজ জয়সিংহ মুসঙ্গির যুদ্ধে রাজেন্দ্রের হস্তে পরাজিত হন। রাজেন্দ্রের পর তাঁর তিন পুত্র--- রাজাধিরাজ (১০১৮-৫২ খৃ.), দ্বিতীয় রাজেন্দ্র (১০৫২-৬৪ খৃ.) এবং বীররাজেন্দ্র (১০৬৩-৭০ খৃ.) ক্রমান্বয়ে চোলসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁরা সকলেই চালুক্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। কোপ্পমের যুদ্ধে রাজাধিরাজ নিহত হন; কিন্তু দ্বিতীয় রাজেন্দ্রের বীরত্বে চালুক্যসেনা পরাজিত হয়েছিল। বীর রাজেন্দ্র পাঁচবার চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন। সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বীর রাজেন্দ্র’র কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সংঘর্ষের অবসান ঘটেনি। কারণ শীঘ্রই চোল-সিংহাসন বিক্রমাদিত্যের শত্রু রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গের করতলগত হয়। কুলোত্তুঙ্গ (১০৭০-১১২০ খৃ.) প্রথম রাজেন্দ্রের দৌহিত্র এবং বেঙ্গীর চালুক্যরাজ প্রথা রাজরাজের পুত্র ছিলেন।

ক্রমে চোলসাম্রাজ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। সিংহল এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অনেক অংশ চোল সম্রাটের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। তৃতীয় রাজরাজ (১২১৩-৪২ খৃ.) তদীয় সামন্ত কোপ্পেরুঞ্জিঙ্গের হস্তে বন্দী হয়েছিলেন। হোয়সলরাজ নরসিংহ তাঁকে উদ্ধার করেন। এই সময় সুদূর দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে হোয়সল এবং পাণ্ড্যরাজগণের মধ্যে বিবাদ চলছিল তৃতীয় রাজেন্দ্র (১২৪৬-৭৯ খৃ.) পাণ্ড্যরাজ জটাবর্মা সুন্দরপাণ্ড্যের (১২৫১-৬৮ খৃ.) অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইরূপে পরাক্রান্ত চোলবংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হয়।

চোল রাজাদের রাজধানী ছিল তিরুভারুরে। এখানে আছেন শিব অর্থাৎ দশম শতকে অচলেশ্বর লিঙ্গমূর্তি গোলার্ধের পঞ্চনাথেশ্বর মন্দিরে। কথিত আছে, রাজা সমাটকারা-র তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব আসেন ভক্ত সকাশে। লিঙ্গমূর্তি গড়েন রাজা। ভক্ত উপস্থিতি প্রার্থনা করেন চিরকালের জন্য দেবতার। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন শিব। ১০০০ পিলারের (৮০৭) মন্দির তথা হল্‌ও হয়েছে। মাহাত্ম্যে অপরিসীম। উত্তরকালে বিজয়নগর রাজা ও মারাঠাদের হাতে গোপুরম্‌ও হয়েছে মন্দিরে। দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম রথটিও (২৩ মি. উঁচু) এই মন্দিরে।

জনশ্রুতি, রথ টানতে ১০০০০ লোকের প্রয়োজন হোত সেকালে। মার্চের কার ফেস্টিভ্যাল খুবই চমকপ্রদ উৎসব। ▌

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা
স্বস্তিকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা
অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম
—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬
দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অনন্যতা

রবীন সেনগুপ্ত

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত হলো— গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও চণ্ডী। এই সমস্ত গ্রন্থগুলিতে রাধা, গণেশ, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ষষ্ঠী, মনসা, গঙ্গা, বিশ্বকর্মা, ধর্মরাজ ও পরশুরাম সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না অথবা খুবই কম তথ্য পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ শাস্ত্রে এইসব দেবদেবীর প্রত্যেকের সম্পর্কে এতটাই তথ্য পাওয়া যায় যে শাস্ত্র গবেষকরা, পুরাণ বিষয় কাহিনিকাররা, চিত্রনাট্যকার, চলচ্চিত্র ও সিরিয়াল নির্মাতারা এই পুরাণটির প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য হন। এটাই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রথম অনন্যতা।

দ্বিতীয় অনন্যতা হলো যে শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ এবং বিষ্ণুর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের চেহারা ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু পার্থক্যের কথা অন্য শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু সেইসব পার্থক্যের কারণ ও মীমাংসা কোথাও সুস্পষ্ট ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে।

তৃতীয় অনন্যতা হলো, ঈশ্বর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজনের পর কেমন করে তাঁর সৃষ্টির বিবর্তন ঘটান— সেইটাই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। ব্রহ্মা কর্তৃক বিবর্তন থেকে ব্রহ্মবৈবর্ত নামটি এসেছে। এই নামকরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে বিবর্তনের ধারণাটি ডারউইন, ল্যামার্ক প্রমুখ বিজ্ঞানীর জন্মের বহু বৎসর পূর্ব থেকেই ভারতীয় শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রপাঠকদের জ্ঞাত ছিল। সৃষ্টি এক ভাবে স্থির হয়ে নেই, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এবং দেবদেবী, মানব, দানবদের কর্মফলে তা যুগে যুগে পরিবর্তিত বা বিবর্তিত হয়েছে— এই সত্যর সবচেয়ে ভাল দিশারি হলো ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের চতুর্থ অনন্যতা হলো, সমস্ত প্রধান দেবদেবীদের কবচ তৈরির মন্ত্র, স্তোত্র এই পুরাণে এত অধিক সংখ্যায় রয়েছে যা অন্য কোনো পুরাণে নেই।

তাহলে আমরা ধর্মসভায় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পাঠ ও ব্যাখা না করে গীতা, ভাগবত, রামায়ণ— এই সব শাস্ত্র পাঠ করি কেন?

এর উত্তরে বলা যায় যে ব্রহ্মবৈবর্তে এবং মহাভারতে বেশ কিছু ঘটনার কথা রয়েছে যা সর্বসমক্ষে বললে মানুষ ভুল বুঝতে পারে, অশালীন বিষয় বলে লজ্জা পেতে পারে, গোপন কবচ মন্ত্র ও স্তোত্রাদি নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে দেখলেই সব কিছু নেওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক গুরুরা উপযুক্ত আধার দেখেই ভক্তকে তা প্রদান করতে পারেন। শাস্ত্রে বারংবার বলা আছে যে 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম' অর্থাৎ মুনিদেরও ভুল হয়, দেবতাদেরও ভুল হয়। সেই সব দোষের কাহিনি অন্য পুরাণের চেয়ে ব্রহ্মবৈবর্তে অধিক রয়েছে। এতে হিন্দু বিরোধীরা ব্যঙ্গ করার আরো বেশি সুযোগ পেয়ে যাবে বলে— নানা রসে ভরপুর, প্রচুর সদবাণীতে পরিপূর্ণ, অজস্র মীমাংসা তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকে আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই এবং পুরাণটির নির্বাচিত কিছু অংশ সমাজে প্রদান করে থাকি। রাধাতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব,— এই পুরাণটিতে এতটা বিস্তৃত রূপে রয়েছে যে তা হিন্দু সমাজকে পরিপুষ্ট করে চলেছে যুগযুগ ধরে। গীতার বিভূতি যোগের আরো বিস্তৃত বর্ণনাও আছে এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। আর আছে নিখুঁত সব ভবিষ্যদ্বাণী।

সব মিলিয়ে বহুতর জটিল প্রশ্নের মীমাংসা পেতে যাঁরা একান্ত আগ্রহী, সমস্ত দেবদেবীর বিষয়ে জানতে যাঁরা খুবই উৎসুক— তাঁদের পাঠ করতেই হবে এই অনন্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ইতিহাসের গল্প

জালালাবাদের রণাঙ্গনে

১৯৩০ সাল। মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সফল হয়েছে। টেলিফোনের তার ছিঁড়ে, রেললাইন ভেঙে দিয়ে বিপ্লবীরা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সমস্ত যোগাযোগ। ইংরেজরা তৎপর হয়ে পড়েছে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য। বিপ্লবীদের তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা। তখন মাস্টারদা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আশ্রয় নিলেন জালালাবাদ পাহাড়ে। চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গরম। খাবার নেই, তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যায়। তার ওপর প্রখর রোদ। সেনানায়ক লোকনাথ বলকে নিয়ে মাস্টারদা পরবর্তী পরিকল্পনা করছেন। এমন সময় পাহাড় থেকে দেখতে পেলেন কালো ধোঁয়া উড়িয়ে একটি ট্রেন আসছে। তার মানে ভেঙে দেওয়া রেললাইন আবার তৈরি হয়েছে। মাস্টারদা নিশ্চিত হলেন— ইংরেজে সেনা তাদের সন্ধান পেয়ে গেছে। এবার বাইরে থেকে পুলিশ আসতে শুরু করবে।

কাছেপিঠে কোনো স্টেশন নেই, অথচ ট্রেনটি পাহাড়ের কাছে এসেই থেমে গেল। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বেলা তিনটে নাগাদ মিলিটারি সেনারা পিল পিল করে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। মাস্টারদাও বিপ্লবীদের নিয়ে তৈরি। ইংরেজ সেনা পাহাড়ে কিছুটা উঠতেই দূর থেকে শোনা গেল সেনানায়ক লোকনাথ বলের কমান্ড— 'হল্ট'। তারপরেই 'ফায়ার'। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় কাঁপিয়ে বিপ্লীদের পঞ্চাশটি রাইফেল গর্জে উঠল। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে চলেছে শত্রুসেনার দিকে। হঠাৎ ওপর থেকে এভাবে গুলি ছুটে আসায় মিলিটারি সেনা হকচকিয়ে গেল। পিছু হঠতে থাকল তারা। তাই দেখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে লাগল বিপ্লবীরা। চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই ধ্বনি।

এমন সময় পাশের দুটি পাহাড় থেকে লুইসগানের গুলি ছুটে আসতে লাগল বিপ্লবীদের দিকে। বিপ্লবীরাও অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠলো। পাল্টা জবাব দিতে লাগল তারা। দু'দিকে থেকে প্রবল গুলিবর্ষণ চলছে। সব বিপ্লবীদেরই বয়স ১৪ থেকে ১৯-র মধ্যে। মৃত্যুর পরোয়া নেই কারো, অসীম সাহসে লড়াই করছে। মাস্টারদা তাদের মনে এমনই দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা বিপদ দেখা দিল। ধোঁয়া আর কালি জমে বিপ্লবীদের বন্দুকগুলি অকেজো হতে শুরু করেছে। এক্ষুনি পরিষ্কার না করলে সেগুলি আর চালানো যাবে না। এই পরিস্থিতি সামলাতে মাস্টারদা নিজেই এগিয়ে এলেন। বুকে হেঁটে পাহাড়ের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত গেলেন। লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে অকেজো বন্দুকগুলি পরিষ্কার করে সেগুলি পৌঁছে দিতে লাগলেন বিপ্লবীদের হাতে। সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। বুকে হাঁটার যন্ত্রণা ভুলে তিনি এই কাজ করে যেতে লাগলেন। মাস্টারদাকে দেখে বিপ্লবীদের মনোবল যেন হাজারগুণ বেড়ে গেল।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ চলছে। কিন্তু মেশিনগানের সামনে সাধারণ বন্দুকের গুলি কতক্ষণ। বিপ্লবীদের রক্তে ভিজে যেতে লাগল জালালাবাদের পাথুরে মাটি। যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করল বারোজন বিপ্লবী। তারপর রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ইংরেজ সেনাবাহিনীর গুলির আওয়াজ বন্ধ হলো। মাস্টারদা বুঝতে পারলেন শত্রুসেনা যুদ্ধে বিরাম দিয়েছে। এবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন নিহত ও আহত বিপ্লবীদের সন্ধানে। রাতের নিস্তব্ধতায় চারিদিকে শোনা যাচ্ছে কেবল আহতের চাপা আর্তনাদ। অন্ধকারে তাদের সবাইকে খুঁজে বের করা হলো। তারপর শহীদ বিপ্লবীদের অভিবাদন জানিয়ে মাস্টারদা ও তার সঙ্গীরা জালালাবাদের রণাঙ্গন ত্যাগ করলেন।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

ওড়িশা

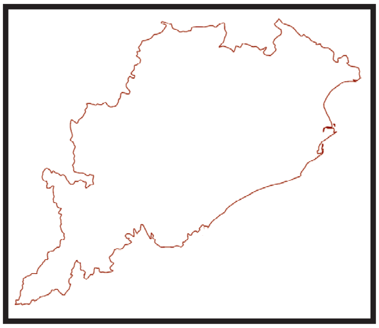

পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য ওড়িশা। মন্দিরময় এই রাজ্য হিন্দু তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। ওড়িশার মোট আয়তন ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮২০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৫৮ জন। জেলা ৩০টি। রাজধানী ভুবনেশ্বর। রাজ্যটির পূর্বদিক ঘিরে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এখানে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহানদী। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বেশ পরিচিতি এই রাজ্যের। চিল্কা হ্রদ, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ও নন্দনকানন দর্শনীয় স্থান। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছর এখানে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম ঘটে। এছাড়াও কোনারকের সূর্যমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত ও নৃত্যকলার দিক থেকেও রাজ্যটি বিশেষ সমৃদ্ধ। ওড়িশি, ঘুমুরা তাদের নিজস্ব নৃত্যশৈলী।

প্রশ্নবাণ

১.বিদ্যাসাগরের মায়ের নাম কী?

২.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুর্দা কে?

৩.ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের মায়ের নাম কী?

৪.ভগিনী নিবেদিতার মায়ের নাম কী?

৫.মধুসূদন দত্ত'র বাবা কে?

উত্তর : ১. ভগবতী দেবী ২. দ্বারকানাথ ঠাকুর। ৩. রেবতীবাঈ। ৪. মেরি ইসাবেল। ৫. রাজনারায়ণ দত্ত।

ছবিতে অমিল খোঁজ

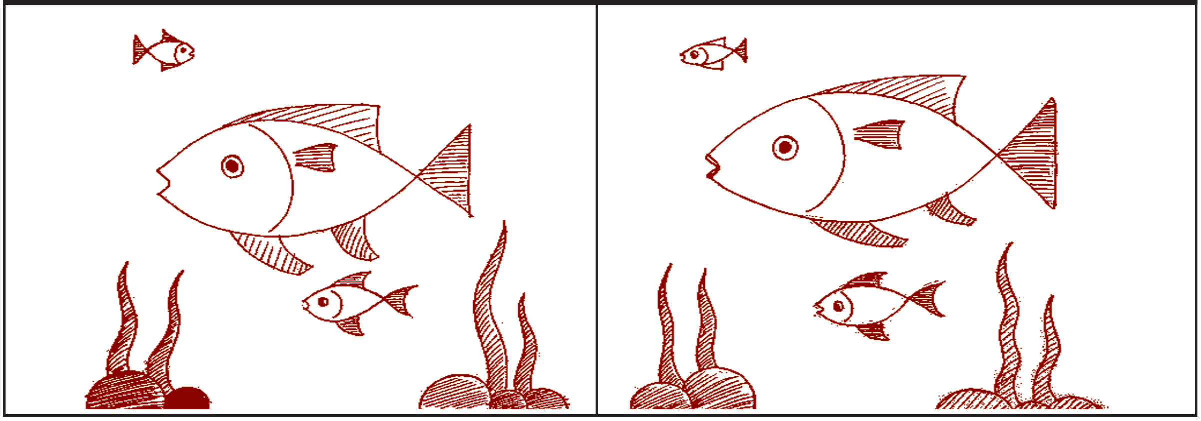

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) র থ র প শ

(২) কু লা পা ক ল

৩ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) রক্তকরবী (২) অংশুমান

উত্তরদাতার নাম

রিনিশা রায়, মুন্সিরহাট, হাওড়া।

পিঙ্কু সরকার, গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর।

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) কা দি অ না ল

(২) শ ন্ন র ঙ্ক অ দ

৩ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) সারদামণি (২) নবকুমার

উত্তরদাতার নাম

পূজা বরাট, ছাতনা, বাঁকুড়া।

অনুশ্রী হালদার, নিবেদিতা নগর, কলকাতা—৪৬।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

অঙ্গনা

প্রকৃতি, পরিবেশ ও নারী

সুতপা বসাক ভড়

ছোটবেলায় ঠাকুমা-দিদিমার কাছে গল্প শুনেই আমরা বড় হয়েছি। এই প্রজন্মের কিছু ছোটোরাও তার ব্যতিক্রম নয়। এইসব গল্পের মধ্যে একটি নাম বারবার ঘুরে ফিরে আসত— সেটি হলো জঙ্গল। এই জঙ্গল মানে প্রকৃতি--- যেখানে গাছপালা, ফুল-লতা-পাতা,পুকুর, নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু ইত্যাদি। প্রকৃতির ওইসব একাত্ম অঙ্গগুলি কথা বলা এক-একেকটি জীবন্ত চরিত্র। ওইসব চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের কত মিলই না খুঁজেছি ছোটবেলায়। সরল মন আর প্রকৃতি প্রেম একাকার হয়ে যেতো।

প্রকৃতি এবং পরিবেশকে ভালবাসতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকেই শিখেছি। তাঁরা আমাদের হাত ধরে দেখিয়েছেন সূর্যোদয় দেখার আনন্দ, বীজ থেকে নতুন চারা বেরোনোর দৃশ্য। ফুল ফুটলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরের ছুটে আসা, প্রজাপতির রঙিন ডানা মেলে ফুলের ওপর বসা, ভোরবেলা সবুজঘাসে কামিনী ফুলের আঁচল বেছানো আর দুর্গাপুজোর আগমনীবার্তা বয়ে আনা, শিউলিফুল কুড়ানোর মজার সঙ্গে কি কোনো কিছুর তুলনা হয়! পুকুরের বুকে মাছের সাঁতার কাটা, এক পশলা বৃষ্টির পরে আকাশে রামধনু দেখার যে আনন্দ, সেকি ভাষায় প্রকাশ করা যায়!

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, মহিলারা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সমস্যাগুলির প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল। ভারতীয় গ্রামীণ মহিলারা জ্বালানির জন্য ঝরে যাওয়া পাতা ও শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে আনেন। গাছ কাটার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। তাঁরা জল, জঙ্গল, জমির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নিয়েছেন। সাধারণত পুরুষেরা বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার করে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন আর মহিলারা সংসার, জমির যত্ন, গবাদিপশুর লালন পালন, গাছের পূজা ইত্যাদিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। প্রাচীনকাল থেকেই আমরা বট, অশ্বত্থ, নিম, কলা, বট, বেল ইত্যাদি গাছকে পুজো করি। 'কঙ্কর কঙ্কর মেঁ শঙ্কর হ্যায়'— একথা আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তাইতো শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গ ভক্তিভরে পূজিত হয় আমাদের দেশে। একদিকে প্রকৃতি নারীর কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে, অপরদিকে নারী তার স্বভাবসুলভ পেলবতার সঙ্গে লালন পালন করেছে পুজো করছে, রক্ষা করেছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতিদেবী তো নারীরই প্রতিমূর্তি।

পরিবেশ রক্ষায় সর্বপ্রথম নারী আন্দোলন শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে, যখন যোধপুরের মহারাজা তাঁর নতুন প্রাসাদ তৈরির জন্য একটি জঙ্গল থেকে গাছ কাটার আদেশ দেন। রাজস্থানের এক মহিলা— অমৃতা দেবী এই গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়ান। যখন কাঠুরেরা গাছ কাটতে আসে, তখন তিনি একটি গাছকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন— কাটতে বাধা দেন। এই সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি জন-আন্দোলনের রূপ নেয়। গাছকাটাও বন্ধ হয়। অমৃতাদেবী বিশ্নোই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায় প্রকৃতিপ্রেমী হিসাবে পরিচিত।

□ চিপ্‌কো আন্দোলন— উত্তরাখণ্ডের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে পুরুষদের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় ঠিকাদারের লোকজন গাছ কাটতে গেলে গ্রামীণ মহিলারা খবর পেয়ে ছুটে এসে এক একেকটি গাছকে চিপ্‌কে (জড়িয়ে) ধরেন। তাঁদের নেতৃত্ব দেন গৌরাদেবী নাম্নী পঞ্চাশোর্ধ অশিক্ষিতা একজন মহিলা।

□ জাপানে ১৯৫০ সালে নাকাবারু এবং সনরোকু মহিলা সমাজের আন্দোলনের ফলস্বরূপ স্থানীয় সরকার ঐ এলাকাকে দূষণমুক্ত করার জন্য বৃক্ষচ্ছেদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

□ কেনিয়াতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ওয়ানগারি মাথাই ১৯৭৭ সালের জুন মাসে গ্রীনবেল্ট মুভমেন্ট শুরু করে হাজার হাজার মহিলাকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করেন। ২০০৫ সালের মধ্যে তারা ৩০০ লক্ষেরও বেশি গাছ লাগান। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

□ ব্রাজিলের মহিলা সংগঠন একাও ডেমোক্র্যাটিকা ফেমিনিনা গাউচা (এ ডি এফ জি) রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিরোধিতা ও পরিবেশ রক্ষায় সরকারকে আইন প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

□ থাইল্যান্ডের টুন্‌জাই ডিটিস— হিল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্থাপন করে এবং পার্বত্য এলাকার ২৮টি গ্রামের ৫টি উপজাতিকে স্বনির্ভর করে তুলেছে স্থায়ী কৃষিকাজ এবং পর্যাবরণ সংরক্ষণের মাধ্যমে।

পরিবেশ রক্ষায় নারীর অবদান মানবসমাজ তথা সমগ্রবিশ্বে অপরিমেয়। ভগিনী নিবেদিতা নারীসমাজকে আহ্বান করে বলেছে--- ''এসো আমরা সরলতাময় পরিবেশে ফিরে যাই এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি। ফিরে যাই সৃষ্টির সেই অনাবরণ প্রকাশের মধ্যে, যাকে সৌন্দর্য বলা হোত; ফিরে যাই সেই প্রাচীনকালের চিন্তার গভীরতায়, যা সংস্কৃতি বলে পরিচিত ছিল। সেই মেঝেতে মাদুর পেতে বসে উচ্চ চিন্তা করা! এসো, আমরা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করি, যাতে উপকরণের প্রয়োজন হয় না। এসো, আমরা মনে প্রাণে যথার্থ জীবন গঠনের জন্য সচেষ্ট হই।" ■

অতিথি কলম

পাকিস্তানের সঙ্গে মোকাবিলার পন্থা

মনোজ যোশী

গুরুদাসপুর ও উধমপুরে উপর্যুপরি দু'টি পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতের কাছে প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজন দরজায় কড়া নাড়ছে। বিবেচনা করলে দেখা যায় তিনটি রাস্তা খোলা আছে।

(১) যেমন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তেমনই চলুক।

(২) তেড়ে ফুঁড়ে 'টিট ফর ট্যাট' পদ্ধতিতে দাওয়াই।

(৩) কিংবা পাকিস্তান থেকে মুখ ফিরিয়ে সব কিছু অগ্রাহ্য করো।

গত বছরটি একটু দোলাচলের মধ্যে সরকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিকল্প দু'টিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি দিল্লী প্রথম রাস্তাটিই অবলম্বন করেছে।

মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের সক্রিয়তার জবাব যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে দেওয়ার পাশাপাশি আলাপ আলোচনাও চালিয়ে যেতে পারলে কট্টরবাদীদের দমিয়ে রাখার বিষয়টাও চালু থাকবে। কোনো মতেই এই কৌশল দেশের পক্ষে অসম্মানজনক নয়। খেয়াল করলে দেখা যাবে রাজীব গান্ধীর আমলের পর থেকেই দেশের সরকারগুলি কমবেশি এই নীতিই অনুসরণ করে এসেছে। অটলবিহারী বাজপেয়ী কারগিলে পাকিস্তানি বিশ্বাসঘাতকতার পরও এই আগ্রাসনের পাণ্ডা মুশারফের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এর ফলে যে সফল চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে জম্মু ও উপত্যকায় সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও হিংসা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। আর এই কৌশলকে ত্রিশ বছরের মেয়াদি একটি পরিকল্পনা ধরে যদি লাভ-ক্ষতি, সমৃদ্ধির হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে বিগত দু'টি দশকের পর ভারত যতটা শক্তিশালী হয়েছে সেই নিরিখে পাকিস্তান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর শক্তি।

একদিকে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ প্রতিহত করতে দেশকে যতটা সম্ভব প্রস্তুত ও শক্তিশালী করে তোলা এবং অন্যদিকে পাকিস্তানের যে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন অংশটি তাদের দেশে আত্মঘাতী পন্থা যা হিংসা-প্রতিহিংসার মাধ্যমে দেশকে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে তা থেকে ফেরাতে প্রস্তুত, তাদের সঙ্গে আলোচনার সদর্থক পদ্ধতি চালু রাখা।

হ্যাঁ এটা ঠিকই, নাগাড়ে বোমাবর্ষণ করে যদি আমরা পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানাগুলি গুঁড়িয়ে দিই ও পত্রপাঠ পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে সে দেশে ফেরত পাঠাই তাহলে আমরা এক বিরাট মানসিক পরিতৃপ্তি হয়ত পাব। কিন্তু এই দু'টি রাস্তাই পাকিস্তানের জঠরে পালিত হওয়া সন্ত্রাসবাদী-বাহিনীর হাতই শক্ত করবে। তাদের আমাদের সঙ্গে গঠনমূলক কোনো লেনদেন নেই, তারা সদাই চাইবে ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তার অর্থনৈতিক উন্নতির প্রকল্পগুলি থেকে সরে আসুক।

একটু পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে ঠিক যখনই উভয় দেশের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা আধিকারিকরা বা প্রশাসনিক প্রধানরা সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ও পাকিস্তানে শ্লথগতিতে চলা মুম্বই হামলার মামলাগুলিকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন তখনই সন্ত্রাসবাদী হামলা দু'টি হলো। এরকমই ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে মনমোহন সিং ও নওয়াজ শরিফের মধ্যে নির্ধারিত আলোচনার ঠিক আগেই সেনাবাহিনীর ছদ্মবেশে সন্ত্রাসবাদীরা কাথুয়া জেলার হিরানগরে হামলা চালিয়ে বেশ কিছু পুলিশ ও নিরীহ নাগরিককে হত্যা করে। অবশ্য জবাবি গোলাবর্ষণে তাদের সকলেই নিহত হয়।

ঠিক একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ২০১৪-র নভেম্বরে নেপালের ধূলিখেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও নওয়াজ শরিফ যখন আলোচনায় মিলিত হচ্ছিলেন তখনই জম্মুর 'আর্নিয়া' অঞ্চলে সন্ত্রাসীরা ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতে নিহত হওয়ার আগে সামরিক বাহিনীর তিনজনকে হত্যা করে।

তবে সাম্প্রতিক গুরুদাসপুর ও উধমপুর-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন অঞ্চলে আক্রমণ চালানো এ যাবৎ চালু পরিকল্পনার থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। গত পাঁচ বছরের সেনার ছদ্মবেশে যাবতীয় আক্রমণগুলি জম্মু ও পাঠানকোট সংযোগকারী জাতীয় সড়কের দু'দিক ধরেই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টা শুধু সড়ক পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিনা তা গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। প্রথমেই সন্দেহ জাগে ধরা পড়া জঙ্গি নাভেদ ও তার সঙ্গীদের নিয়ে। সেই উত্তর প্রান্তের কুপওয়াড়া থেকে গোটা উপত্যকা অতিক্রম শুধু নয়, পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী পার করে উধমপুরে এসে বি এস এফ-এর বাসের ওপর আক্রমণ চালালো।

এখন কর্তৃপক্ষ বন্দী জঙ্গি নাভেদের কাছ থেকে কতটা কী জানতে পারছে সেটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই নাভেদই কিন্তু

পাকিস্তানের সমান্তরাল বেআইনি বাহিনীর মোকাবিলার বা মাঠে নেমে লড়াই চালানোর অন্তিম ব্যক্তি। পেছনে তো শুধু মাথার ভিড়। তাই যারা তাকে আজমল কাসভের সঙ্গে তুলনা করছে তারা একটু সরলীকরণ করে ফেলছে। ২৬/১১-এর মুম্বই হামলার ক্ষেত্রেও কাসভই ছিল কামানের মুখে লড়াইয়ের শেষ বলি, কিন্তু সেই আক্রমণ ছিল এক অতি বড় জটিল ও সম্ভাব্য গভীর অভিঘাতসম্পন্ন চক্রান্তের পরিণতি। অন্যদিকে, নাভেদ বহু বছর ধরে জারি থাকা জম্মুর আন্তর্জাতিক সীমান্তে সংঘর্ষ ও সীমানা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আর একটি সংযোজন।

কিন্তু ভারত পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিকতার ক্ষেত্রে এখনও সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। তাৎক্ষণিকভাবে সরকার হয়ত এই আক্রমণ হজম করেছে। কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তা স্তরের আধিকারিকের সাক্ষাৎকার ও আলোচনা এই মাসের শেষেই হবে। সেখানে এই প্রসঙ্গ সিংহভাগ অধিকার করবে।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাকিস্তানের ফেডারেল তদন্তকারী সংস্থার ভূতপূর্ব অধিকর্তা তারিফ খোসা তাঁর দেশের ডন পত্রিকায় এক চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনে ২০০৮-এর মুম্বই আক্রমণের আগে পাকিস্তানে কতবার কীভাবে এই চক্রান্তের ছক কষা হয়েছিল, তার যে গুপ্ত তথ্য তদন্তে উঠে এসেছিল তা বিস্তারিত বিবরণে ফাঁস করেছেন। সেখানে ভারতের পক্ষে সংগৃহীত তথ্যগুলির সঙ্গে পর্যাপ্ত মিল পাওয়া গেছে— এগুলি নতুন কিছু নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে তদন্ত অধিকর্তা অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব পাকিস্তানস্ ফেডারাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি হিসেবে যিনি অবসর নেন ২০১১ সালে, চার চারটি বছর পার হওয়ার পর কেন তিনি এখন খুল্লামখুল্লা তাঁরই দেশের ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা প্রকাশ্যে আনলেন। তাও আবার ছাপা হলো একেবারে প্রথমশ্রেণীর ঐতিহাসিক ডন পত্রিকায়?

আজকের পাকিস্তানে এক অতি টালমাটাল পরিস্থিতি মাথা চাড়া দিয়েছে। অবিশ্বাসের বাতাবরণ তীব্র। এর হাতেগরম উৎস হচ্ছে ডিসেম্বর ২০১৪-র অতি মর্মান্তিক ঘটনাটি। তাহরিক-ই- তালিবানিরা একটি বিদ্যালয়ে ঢুকে ১৪৫ জনকে নৃশংসভাবে গুলি করে খুন করে। এদের মধ্যে ১৩২ জন নিতান্তই দুধের শিশু। এই প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব অধিকর্তা তীব্র আক্ষেপের সুরে বলেছেন— “আমি বিশ্বাস করতে চাই যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব উভয়েই নিশ্চয় দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গি কার্যকলাপ ও চরমপন্থীদের সম্পূর্ণ নির্মূল করবে।”

এই আশা সত্যিও হতে পারে আবার নিতান্ত দুরাশাই থেকে যেতে পারে। তা সময়ের হাতে। তবে দিল্লীর যে কোনো সরকারের কাছেই আজ উধমপুরের ঘটনা একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। হাতে নাতে ধরা পড়েছে যে সন্ত্রাসবাদী সে অত্যন্ত অবহেলাভরে স্বীকার করেছে “স্রেফ হিন্দুয়োঁকো মারনা হ্যায়”। অতীতের বহু সরকারই তাদের প্রচেষ্টাগুলিকে আধাখেঁচড়া করে ফেলেছে। এখন দীর্ঘস্থায়ীভাবে একটি পরিকল্পনাই নেওয়া প্রয়োজন আর তা হলো ‘সংযত সংঘাত ও আলোচনার প্রক্রিয়া’ (Containment & engagement)।

এই পরিকল্পনার মূলে রয়েছে একদিকে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ প্রতিহত করতে দেশকে যতটা সম্ভব প্রস্তুত ও শক্তিশালী করে তোলা। অন্যদিকে পাকিস্তানের যে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন অংশটি তাঁদের দেশে আত্মঘাতী পন্থা যা হিংসা-প্রতিহিংসার মাধ্যমে দেশকে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে তা থেকে ফেরাতে প্রস্তুত, তাঁদের সঙ্গে আলোচনার সদর্থক পদ্ধতি চালু রাখা।

(লেখক নতুন দিল্লীর অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের বিশিষ্ট ফেলো)

সৌজন্যে : দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া

পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে সকলের কাছে সমাজ সেবা ভারতীর পক্ষ থেকে আবেদন ঃ—

গত কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় ধারাবাহিক বৃষ্টির জন্য ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন জেলার ব্লকের পর ব্লক জলে প্লাবিত। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে, বহু বাড়িঘর ধসে এবং ভেসে গিয়েছে। এমতাবস্থায় সমাজ সেবা ভারতী এই দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পদ্ধপরিকর।

এই কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই সমস্ত বঙ্গবাসীর কাছে সমাজ সেবা ভারতীর আবেদন, আপনারা এই ত্রাণের কাজে মুক্ত হস্তে দান করুন।

সাহায্যের অর্থ চেকে প্রদান করলে করমুক্ত হবে

SAMAJ SEBA BHARATI PASCHIMBANGA

UCO BANK, Branch : Beadon Street
Account No. 17390100004064 IFSC/RTGS Code UCBA0001739,
MICR Code No.-700028104
Your contribution is eligible for Exemption
Under Section 80-G (5) (vi) of IT Act 1961
PAN No. AAETS 1994D

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরানের পরমাণু শান্তি চুক্তির সাফল্য অন্য রাষ্ট্রগুলির উপর নির্ভরশীল

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায়
(অবঃ প্রাঃ)

ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তি ১৪ জুলাই ২০১৫-তে সম্পন্ন হলো। শুধু ইরান-মার্কিন চুক্তি বললে ভুল হবে। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স চুক্তির একদিকে, অন্যদিকে ইরান।

অনেক বছর যাবৎ ইরান পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের প্রয়াস করে চলেছিল। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বলেই এই অস্ত্র নির্মাণকে তারা আখ্যায়িত করেছিল। যদিও ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীন এই রাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমান সম্প্রদায়ের সুন্নিগোষ্ঠীর হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছিল। আবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুন্নিসম্প্রদায়ের অভিযোগ শিয়া গোষ্ঠীর লোকেরা বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ ঘটিয়ে চলেছে, যেমন লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন ইত্যাদি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াস ছিল, ভারত-মার্কিন শান্তিপূর্ণ পরমাণু চুক্তির আদলে ইরানের সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক। কিন্তু কাজটা সহজ ছিল না। চীন, রাশিয়া-সহ ইউরোপের আরও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিকে সঙ্গে নিয়ে (পি ৫+১) এই চুক্তি সম্পাদন করা সহজ কাজ নয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নিজের স্ট্রাটেজি আছে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আছে। প্রথমে নিজের পক্ষের সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সহমত প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই সহমতের ভিত্তিতে ইরানের সঙ্গে আলোচনা এবং দর কষাকষি করা।

একথা ভুললে চলবে না, ২০০৫-এ ভারত-মার্কিন শান্তিপূর্ণ চুক্তির অনেক আগে যখন ভারত পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবন্ধকতা প্রয়োগ করেছিল। ইরানের বিরুদ্ধেও তেমনি কঠোর প্রতিবন্ধকতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োগ করেছিল। ভারতের একটাই বক্তব্য ছিল— দ্বিচারিতা করা চলবে না। বিশ্বের সমস্ত পরমাণু অস্ত্রে শক্তিধর রাষ্ট্রকে তাদের পরমাণু অস্ত্র নষ্ট করে ফেলতে হবে, ভারতও তৎক্ষণাৎ পরমাণু অস্ত্র প্রকল্প সমাপ্ত করে দেবে। শান্তিপূর্ণ পরমাণু চুক্তি সম্পাদনের পরও পরমাণু শক্তি কেন্দ্রগুলিকে জ্বালানি ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী সংস্থাগুলি ভারতকে প্রয়োজনীয় রসদ দিতে অস্বীকার করেছিল।

আমেরিকা-ইরাণ পরমাণু চুক্তি। ইউ এস সেক্রেটারি অব স্টেট জন কেরি এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী জাভেদ জাফির।

তার পুরোভাগে ছিল চীন। তারা এটাও দাবি করেছিল— পাকিস্তানকেও ভারতের মতো সমান সুযোগ দিতে হবে। সহজেই অনুমেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ভিয়েনাতে নিজেদের মধ্যে সহমত প্রতিষ্ঠায় কত বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছিল।

বহু বছর যাবৎ ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে রাশিয়ার বন্ধুরাষ্ট্র মনে করত এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র, অর্থ সবকিছুই উজাড় করে দিত। কারণ পাকিস্তান 'সেনটো'র সদস্য ছিল। ভারত ছিল জোট নিরপেক্ষ। 'শান্তিপূর্ণ পরমাণু চুক্তি' সম্পাদনের পর ভারত-মার্কিন সম্পর্ক বহুলাংশে সহজ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইরানের সঙ্গে তেমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আশা করবে। ভারত সব সময়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও অন্য সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই আশা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের চুক্তি হলেও বিশ্বের বহু রাষ্ট্রে এই চুক্তির বিরোধিতা করা হয়েছে। যেমন সৌদি আরব। বহু রাষ্ট্রই মনে করে ইরান চুক্তি সম্পাদন করলেও নিষ্ঠার সঙ্গে চুক্তির শর্ত পালন করবে না। গোপনে তারা পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের প্রয়াস চালিয়েই যাবে। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে চীন, রাশিয়া এবং ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সহমত টিকিয়ে রাখা একটা সমস্যা হয়েও দাঁড়াতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বর্তমানে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ এত কষ্ট করে যে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে, তার শর্তাবলী কঠোরভাবে সব পক্ষকে মানিয়ে চলতে বাধ্য করা।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্দরমহলেই এই চুক্তি নিয়ে বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ হয়েছে। রিপাবলিকান পার্টির সিনেটররা স্থির করেছেন তাঁরা মার্কিন সিনেটে এই চুক্তি হতে দেবেন না। ডেমোক্রাটদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন প্রেসিডেন্ট ওবামার সঙ্গ ছেড়ে এই চুক্তির বিরোধিতা করবেন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, ইরানের ভিতরে বহু মানুষ এই চুক্তির বিরোধিতা করছেন। তবে ইরানের ধর্মীয় প্রধান আয়াতোল্লা খোমেনি এই চুক্তি হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মার্কিন

সিনেটে চুক্তির বিরোধিতা ইরানেও অনেককে চুক্তির বিরোধিতায় উৎসাহ দেবে বলে অনেকে মনে করেন। তবে আশা করা যায় প্রেসিডেন্ট ওবামা মার্কিন সিনেটে এই চুক্তিটি পাস করিয়ে নিতে সক্ষম হবেন।

এর ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরমাণুশক্তি এজেন্সির (আই এ ই এ) দায়িত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুরক্ষা সমিতির গুরুত্বও এই চুক্তির ফলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো বলেই অনেকে মনে করেন। বিশ্বে পরমাণু অস্ত্র সীমিত রাখা ও বিস্তার প্রতিরোধ করার বিষয়ে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তেমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। বিগত এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (পি ৫+ জার্মানি) তাদের খসড়া যখন পেশ করে তখন অনেকের মতে ইরানের খসড়ার সঙ্গে ছিল আকাশ পাতাল তফাত। ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহান তাঁর বক্তৃতায় বিশদভাবে জয়েন্ট কমপ্রিহেন্সিভ অ্যাকশন প্ল্যান অর্থাৎ যুগ্ম সর্বাত্মক কর্মধারার ব্যাখ্যা করার সময় ঘোষণা করেছেন এই চুক্তির ফলে একদিকে ইরানের গবেষণা যেমন চলতে থাকবে, অন্যদিকে প্রতিবন্ধকতা উঠে যাওয়ায় ইরানের নাগরিকদের দুঃখ দুর্দশারও অবসান ঘটবে।

তবে ইজরায়েল এই চুক্তির ঘোর বিরোধী, তারা কিছুতেই ইরানকে বিশ্বাস করতে চায় না। তবে বিশ্বে ইরানের একাকিত্ব ঘুচে যাবে। এই চুক্তির একটা ঐতিহাসিক সম্ভাবনাময় দিকও রয়েছে। ভারত সর্বৈবভাবে এই চুক্তির প্রশংসা করেছে এবং ঘোষণা করেছে— পরমাণু অস্ত্র রহিত বিশ্বের দিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘটল।

অনেকেই মনে করেন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের চুক্তি কয়েক বছর আগে সম্পন্ন হলেও ভারতের পরমাণু ইন্ধনের ভাঁড়ারে তেমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতে পরমাণু রিঅ্যাক্টর বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে, তারাও তেমন বড় ধরনের কোনো ব্যবসা করতে সক্ষম হয়নি।

প্রায় দু-মাসের দম বন্ধ করা প্রতীক্ষার পর অবশেষে ভিয়েনায় ইরানের সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পাঁচ প্রধান ও জার্মানির চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এই চুক্তির একটা দলিল ইরানের সংসদে পেশ করেছেন। সংসদ ১৫ সদস্যের এক সমিতি গঠন করে এই চুক্তির প্রতিটি ধারা এবং উপধারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সংসদকে তাঁদের প্রতিবেদন জমা দেবেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুরক্ষা সমিতিও সর্বসম্মতিতে ওই চুক্তির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। এই চুক্তি একদিকে ইরানের পরমাণু অস্ত্র প্রকল্প যেমন রোধ করতে পারবে, তেমনি ইরানের উপর থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কঠোর প্রতিবন্ধকতাও উঠে যাবে।

গত এক বছর যাবৎ ইরানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই চুক্তির বিরূপ সমালোচনা করে চুক্তির বিরোধিতা করছিলেন। এই সংসদীয় সমিতির মাধ্যমে তাঁদের চুক্তির বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মতামতও প্রকাশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইরানের সংবিধান অনুযায়ী, যে কোনো চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা ওই রাষ্ট্রের সংসদের রয়েছে। ইরান সরকার আশা করে সংসদ চুক্তি অধ্যয়ন করে সন্তোষ প্রকাশ করবে। বিশেষ করে ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা খোমেইনি যখন এই চুক্তির সমর্থন করেছেন তখন চিন্তার কিছু নেই। তবুও ইরানের পরমাণু অস্ত্র প্রকল্প বন্ধ হওয়ায় সমগ্র বিশ্ব স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে। আশা করা যাচ্ছে, এই চুক্তির সমস্ত অংশীদার নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। নিজ নিজ রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার্থে এই বিরাট সাফল্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবেন না। ■

'অতীতের হিন্দু নারীগণ কি আমাদের লজ্জার কারণ ছিলেন যে, তাঁদের লাবণ্য ও মাধুর্য, নম্রতা ও ধর্মভাব, সহিষ্ণুতা ও শিশুসুলভ গভীর ভালবাসা এবং করুণা প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ বর্জন করে আমরা পাশ্চাত্য নারীর বিবিধ তথ্য সংগ্রহ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের দুর্বার আগ্রহ— যা পাশ্চাত্য শিক্ষার অসংস্কৃত ফলমাত্র— তাই গ্রহণ করতে ব্যগ্র হব?

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাজ্যের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন্তর্জলির পথে

নবকুমার ভট্টাচার্য

ভারতের পুলিশি ব্যবস্থার ইতিহাসে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের (আই বি) ভূমিকা অপরিসীম। যদিও বর্তমানে ১৩ নম্বর লর্ড সিনহা রোডে অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন অট্টালিকাটি তার সেই প্রাচীনত্বের নিদর্শন ধরে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কারণ এই দপ্তরে কর্মরত অফিসার ও কর্মচারীরা ঠিকমতো এই মহান ব্রতে অংশ নিতে পারছেন না। তাই খাগড়াগড়ের মতো নানা ঘটনা ঘটে চলেছে।

ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রধান কাজ হলো রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা। বিশ্লেষণ করে ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সরকারকে আগাম সতর্ক করা এবং অবশ্যই সত্যের উপর ভিত্তি করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা, যার উপর নির্ভর করে পরবর্তী ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়। বৃটিশ ভারতে আই বি-কে এক পারদর্শীবাহিনী হিসেবেই গড়ে তোলা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। দক্ষ অফিসার ও দক্ষ কর্মীদের প্রচেষ্টায় এই বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছিল। কিন্তু সত্তরের দশকে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্থার অধঃপতন ঘটতে থাকলো।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রথম শিকার হলো আই বি। পুলিশ সম্পর্কে বামপন্থীদের ধারণা কোনো কালেই ভালো ছিল না। এই মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে বাম নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টায় অনেকেই নিজেদের ভাগ্যলিপি বদলাবার চেষ্টা শুরু করলেন।

এই অফিসার বা কর্মচারীরা অনেকেই আই বি বা এস বি কী কী তথ্য এতকাল সংগ্রহ করে রেখেছে তা জানতেন। তাঁরা এও জানতেন যে ক্ষমতাসীন অনেক বামপন্থী নেতাদের দেশি এবং বিদেশি যোগাযোগের গোপন বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাদেরই প্রচেষ্টায় বামশাসনের প্রথমদিকে এই গোপন ফাইল রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পাচার করা শুরু হয়। আই বি'র শাখা সংগঠনগুলি জেলায় জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলি জেলা পুলিশ সুপারের অধীনে কাজ করে। সেখানেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়ল, গোপনীয়তার বালাই রইল না।

বামরাজত্বেই শুরু হয় আই বি এবং এস বি'র পারদর্শিতা নষ্ট করার প্রতিযোগিতা। অকর্মণ্য অযোগ্য ব্যক্তি দিয়ে পদগুলি ভরাট করার ফলে গোপন তথ্য সংগ্রহ ও তার সঠিক বিশ্লেষণ প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। আই বি-র বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে গিয়ে ঠেকে। ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের এতে তেমন কোনো হেলদোল ছিল না। কারণ তারা অনেক বেশি নির্ভর করতেন তাদের স্থানীয় নেতাদের পাঠানো তথ্যের উপর। কেবল বিব্রত হতে হোত সরকারি আমালাদের। এর প্রতিফলন তখনই আমরা মাঝে মধ্যে দেখতে পেয়েছি। কখনও স্বরাষ্ট্রসচিব, কখনও মুখ্যসচিব, কখনও খোদ ডিজি-র মন্তব্য থেকে। সেই সময়ের নন্দীগ্রাম বা শিলদা কাণ্ডের ঘটনায় আই বি, স্বরাষ্ট্রসচিব আর ডিজি-র তরজার কথা সকলের নিশ্চয়ই স্মরণে রয়েছে। সাম্প্রতিককালে প্রায় সব ঘটনায় এই তরজা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কারণ বামফ্রন্টের দলীয় যে নেটওয়ার্ক ছিল আজকের ক্ষমতাসীন দলের সেই জনসংযোগ নেই এবং জেলাস্তরের আই বি-র শাখা সংগঠনগুলো আজ দুর্বল তাই এখন খাগড়াগড়ের মতো নানা ঘটনা সংগঠিত হলেও কেউ টের পান না।

যখন কোনো সংস্থা তার নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়, তখন তার একমাত্র কাজ হয়ে ওঠে চাটুকারিতা। সত্য তথ্যের বদলে সরকারি দলের পছন্দমাফিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। জঙ্গলমহলে মাওবাদী সংগঠন গড়ে ওঠার মূল কারণ দারিদ্র্য হলেও আই বি-র ব্যর্থতাও অন্যতম কারণ। সেসময় জঙ্গলমহলের মানুষের সমস্যার প্রকৃত তথ্য আইবির প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়নি। আজও প্রকৃত তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। সরকার বলছে জঙ্গলমহল হাসছে। আই বি-র প্রতিবেদন জঙ্গলমহলের মানুষ সুখেই রয়েছে। এখন প্রশ্ন, তাহলে আবার মাওবাদী সমস্যা কেন? সবাই যদি সুখে শান্তিতে রয়েছে তাহলে মাওবাদীরা কিসের ভরসায় জঙ্গলমহলে আবার সংগঠন গড়তে পারছে। আই বি-র জেলা ভিত্তিক সংগঠনগুলো এখন ভোটকেন্দ্রিক কাজকর্ম

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

করতে ব্যস্ত। দেশের নিরাপত্তা দেখতে তারা ততটা আর উৎসাহী নয়। আই বি'র জেলাভিত্তিক সংগঠনগুলোর চরম ব্যর্থতার জন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলি জঙ্গি সন্ত্রাসীদের প্রধান করিডর। সীমান্তে অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও প্রশাসন নির্বিকার।

ভোট প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো আই বি-র জেলা সংগঠনগুলির। এদের কাজ হলো নির্বাচন কেন্দ্রগুলোকে সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে বিভাজন করা এবং কোথায় কত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হবে তার হিসেব করা। মজার কথা, এই বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের এক প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপ থাকে। বিশেষ করে কোন বুথে কোন অফিসার থাকবেন। তাঁর চরিত্র ও মনোভাব কেমন, এসব তথ্য পুলিশের লোকরাই সরবরাহ করে থাকে। এই তথ্যের ভিত্তিতে বুথভিত্তিক রাজনৈতিক দলের কর্মীবাহিনীকে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু আসল কাজটি আরম্ভ হয় আরও আগে। জেলাস্তরে এলাকাভিত্তিক সমীক্ষার কাজটি করা হয় আই বি-র তত্ত্বাবধানে। আই বি-র অফিসাররা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন প্রান্তে। তাঁদের সমীক্ষার ফসল হলো আগাম ভবিষ্যদ্বাণী। এই সমীক্ষাকে সামান্য ঘষামাজা করলেই নির্বাচনী চালচিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যায় আর পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের কাছে সেই আগাম খবর পৌঁছে যায়। যেখানে যেখানে খারাপ ফলাফল হতে পারে সেইসব এলাকায় আরও বিস্তারিত বিবরণ বারে বারে চেয়ে পাঠানো হয়। ইতিবাচক অফিসারদের নাম নিয়ে আলোচনা চলে। তাদের নির্বাচিত ভোটকেন্দ্রে নিয়োগ করবার জন্য প্রস্তুতি চলে। এমনকী সাধারণ হোমগার্ড যারা বকলমে দলের হয়ে কাজ করবেন, তাদেরও নিয়োগে হস্তক্ষেপ হয়। আই বি-র প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে ক্ষমতাসীন দল তাদের কর্মীদের কাজে লাগায়। পুলিশও এই কাজে সহায়তা করে। কোথাও হুমকি, কোথাও বোমাবাজি, কোথাও খুন সব চলে। সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে হয়রানি চলে যাতে

ক্ষমতাসীনরা চিরকালই স্পষ্ট কথা ও স্বচ্ছ কাজ পছন্দ করেন না। তাঁরা চায় অসীম দাসত্ব। এই বিষয়ে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই।

প্রতিপক্ষের কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে এলাকাছাড়া হয়। বামরাজত্বে আমরা এই ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু মজার কথা যে রাজ্যের উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারেরা আরও উচ্চপদ পাওয়ার লক্ষ্যে এমন অনৈতিক কাজে সহায়তা করে থাকেন। বর্তমান রাজত্বেও এই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। সরকার বদল হলেও পুলিশের ভূমিকা বদল হয়নি। কারণ ক্ষমতাসীনরা চিরকালই স্পষ্ট কথা ও স্বচ্ছ কাজ পছন্দ করেন না। তাঁরা চায় অসীম দাসত্ব। এই বিষয়ে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই। তাই কেউ বা প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর চরণ স্পর্শ করেন আবার কেউ কোনো মন্ত্রীকে জুতো পরিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করেন। আন্না হাজারেরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন কিন্তু এ রোগ তার চেয়েও বহুগুণ ছোঁয়াচে।

সারা ভারতের নিরিখে গোপন তথ্য সংগ্রহ সুনিশ্চিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, রাজনৈতিক হানাহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রতিরোধে আই বি রিপোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত সরকার বারবার রাজ্যগুলিকে এই বিষয়ে সতর্ক করে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও তারা করে। আমাদের রাজ্যে কিন্তু আই বি-র জেলা শাখাগুলিকে আজ অকাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আই বি-র কাজ কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকারি দলের দালালি করা নয়, অথচ আজ এই কাজই হচ্ছে। আই বি-র ব্যর্থতায় দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আজ ব্যহত হতে বসেছে। ■

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street,
Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

রিকশাচালকের ছেলে আই এ এস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ছেলের ফলাফল কী হবে তা ভেবে গত দশটা রাত তাঁর চোখে ঘুম নেই। শরীরটাও বেশ ক্লান্ত। কিন্তু রুটিরুজির সন্ধানে বের তো হতেই হবে তাঁকে। অগত্যা রিকশা নিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালেন ষাটোর্ধ্ব নারায়ণ জয়সওয়াল। বারাণসী রেল স্টেশনেই যাত্রীর অপেক্ষায় ছিলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী না মেলায় ছোট্ট ঘরটিতে ফিরছিলেন রিক্সা চালিয়ে। তখনও খবরটা তিনি পাননি। এলাকার লোকের মুখে মুখে তখন তাঁর ছেলের নামই ঘোরাফেরা করছে। রাস্তায় তাঁকে দেখে এক পথচারী শুভেচ্ছা জানাতেও ভুললেন না। কিন্তু তখনও তিনি ধোঁয়াশার মধ্যে। কী কারণে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো হলো তাও তিনি বোঝেননি। এবার বাড়ির সেই পরিচিত গলিতে ঢুকতে গিয়েই তাঁর কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হলো। উৎসবের আকার ধারণ করেছে সেই সরু গলি। কারণ রিকশাচালক নারায়ণ জয়সওয়ালের ছেলে গোবিন্দ জয়সওয়াল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেছে। তিনি একজন আই এ এস অফিসার হবেন।

২০০৬ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সসম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন বারাণসীর গোবিন্দ জয়সওয়াল। ৪৭৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তাঁর স্থান হয় ৪৮ তম স্থানে। কারণ যে প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আজ সে এই জায়গায় তা এক কথায় অভাবনীয়। ছোট থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন একজন আই এ এস অফিসার হওয়ার। তার জন্য যে পরিকাঠামোর প্রয়োজন তার কোনোটাই ছিল না গোবিন্দের। শুধুমাত্র বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তিনি আজ এই জায়গায় পৌঁছতে

বাবার সঙ্গে রিকশায় গোবিন্দ জয়সওয়াল।

পেরেছেন। তিন দিদি, দুই ভাই এবং বাবাকে নিয়ে মোট ৬ জনের পরিবার। শৈশব অবস্থাতেই মাকে হারিয়েছেন। সুতরাং মায়ের স্নেহ কী তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। দিদিদের কোলেপিঠেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। তবে এই পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য মাত্র তাঁর বাবা-ই। রিক্সা চালিয়ে যে রোজগার হোত তা দিয়েই সংসার চালাতেন বাবা নারায়ণ জয়সওয়াল। অভাবের সংসারের মধ্যেও তিনি পাঁচ ছেলেমেয়েকে স্নাতক করিয়েছেন। আজ গোবিন্দ যে আই এ এস হয়েছেন তাঁর কৃতিত্বটাও কিন্তু তাঁরই প্রাপ্য।

ছোট্ট একটি ঘর। সেখানেই বাস এই ৬ জনের। সেখানে থেকে সিভিল সার্ভিসের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পড়াশোনা করা যে অতীব দুষ্কর তা গোবিন্দও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তার ওপর প্রতিদিন ১০-১৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকায় পড়তে বেশ অসুবিধাই হোত। বাড়ির পাশে থাকা কারখানার বিকট শব্দ এবং জেনারেটরের আওয়াজে তাঁকে জানালা-দরজা বন্ধ করে পড়তে হোত। কিন্তু আলোর অভাবে তাও প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। অবশেষে তিনি ঠিক করলেন পড়াশোনা চালাতে গেলে নির্জন জায়গায় যেতে হবে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা তাঁর এক বন্ধুর হস্টেলে গিয়ে তিনি পড়াশোনা শুরু করলেন।

পরবর্তীকালে তিনি এই পড়াশোনা চালাবার জন্য এবং উচ্চতর সুযোগ-সুবিধার জন্য দিল্লী যাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। সেখানে যেতে গিয়েও আর এক বাধার সম্মুখীন হন। রাজধানী শহরে থাকতে গেলে খরচ অনেকটাই বাড়বে। একথা ভেবে তিনি পিছিয়ে আসার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু ছেলের যেমন স্বপ্ন আই এ এস হওয়ার তেমনি বাবার ইচ্ছাও ষোলোআনা। তাই ছেলের স্বপ্নপূরণে ভিটেটুকুও ৪০ হাজার টাকায় বেচে দেন নারায়ণবাবু। তিন মেয়ের বিয়ে দিতে জমিজমা যেটুকু ছিল তা আগেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন তিনি। বাকিটা ছোট ছেলের স্বপ্ন সফল করতে রাখা ছিল বলে জানান নারায়ণ জয়সওয়াল। জায়গা বিক্রির ৪০ হাজার টাকা ছাড়াও তিনবছর ২৫০০-৩০০০ হাজার টাকা প্রতিমাসে দিল্লীতে পাঠাতেন নারায়ণবাবু। প্রাইভেট টিউশন করে ১৫০০ টাকা আয় করতেন গোবিন্দ। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দ জানান, "আমার জীবনে আই এ এস হওয়া ছাড়া কোনো লক্ষ্যই ছিল না। আমি মনে করতাম যে-কোনো ভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে।" তিনি আরও বলেন, "সিভিল সার্ভিস উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমার অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। কারণ অন্য সরকারি চাকরি আগে থেকেই সংরক্ষিত হয়ে থাকে। টাকার অভাবে ব্যবসা করতেও পারব না। আই এ এস হওয়ার পণ আমি আগে থেকেই নিয়েছিলাম।"

এখন তাঁর বাবাকে রিকশা চালাতে দেন না গোবিন্দ। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ইতি টেনেছেন তিনি। এবার তাঁর বাবার স্বপ্ন ছেলেকে সাতপাকে বেঁধে ফেলতে। কিন্তু গোবিন্দের ইচ্ছা ভিন্ন। তিনি চান, বারাণসীকে একটি ভাল প্রশাসন উপহার দিতে। পাশাপাশি তিনি একজন দায়িত্ববান উচ্চমানের আই এ এস আধিকারিক হয়ে উঠতেও আগ্রহী। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম তাঁর জীবনের আদর্শ। কালামের লেখা বই 'অন উইংস অফ ফায়ার' তিনি বহুবার পড়েছেন। কালামকে দেখেই স্বপ্নের বীজ বোনা শুরু করেন তিনি। ■

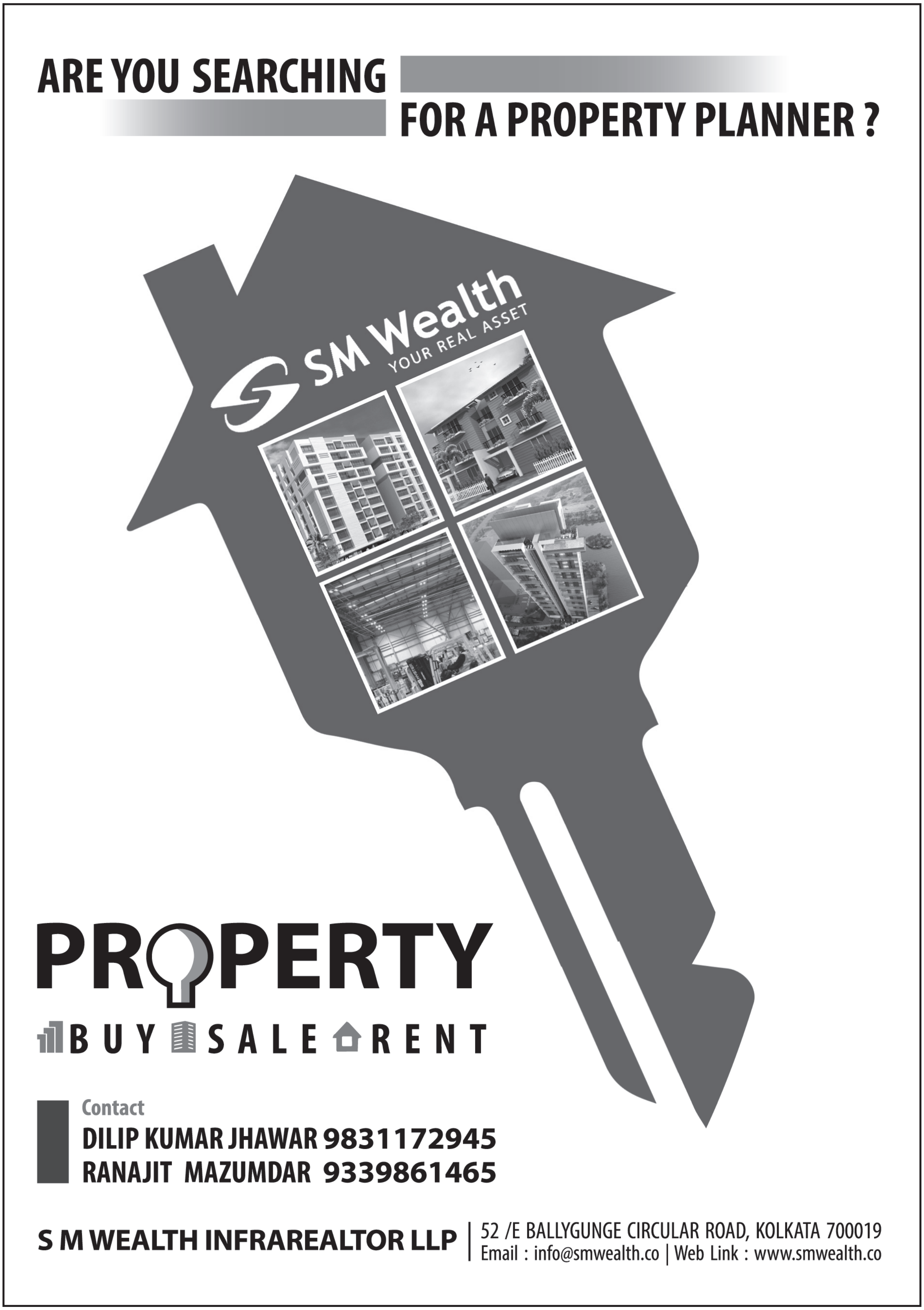
ARE YOU SEARCHING
FOR A PROPERTY PLANNER ?
SM Wealth
YOUR REAL ASSET
PROPERTY
BUY SALE RENT
Contact
DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945
RANAJIT MAZUMDAR 9339861465
S M WEALTH INFRAREALTOR LLP
52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার বিষয়টি এখন আর কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? আধুনিক যুগে বিজ্ঞান যেভাবে এগোচ্ছে, এখন আর প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের বিষয়ে জেনে লাভ কী? ওল্ড ইজ্ গোল্ড যদি মেনেওনি, তাহলে কি আমরা সেই ওল্ড-এর মিউজিয়াম-এর পাহারাদার হয়ে থাকব?

প্রশ্নগুলি আপাততভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চার বিষয়টি এ যুগের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, সাধারণ মানুষ ও যুবসমাজের কাছে উপস্থাপিত করার চেষ্টা কারণ এই যে, বংশ গৌরবের বিষয় অবগত হলে ভিখারিও আত্মমর্যাদা সচেতন হয়ে যায়। এখন যেমন আমাদের মানসিক দাসত্বের দিন চলছে, হীনমন্যতার মানসিকতায় সব বিষয়ে অনুকরণপ্রিয় হয়ে পড়েছি, ভাবছি আমাদের কিছু নাই, সবই ওদের কাছ থেকে নিতে হবে, এখন দেশের গৌরবের বিষয়ে অবহিত হলে— আত্মমর্যাদা আসবে, হীনমন্যতা কমবে, অনুকরণপ্রিয়তা সঙ্কুচিত হবে। বংশগৌরব মর্যাদাবোধ আনে।

> “একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গুণে, গরিমায়, অর্থ সম্পদে ও কর্মক্ষমতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। এর ফলে স্বাধীন চিন্তা এবং অশেষ বাধা সত্ত্বেও চিন্তানুগামী কর্ম করার ক্ষমতা ছিল। আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রত্যেক কর্ম অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ না করে তাদের স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি ও কর্মক্ষমতার অনুকরণ করি, তাহলে আমরাও পুনরায় জগতে গরিমাময় স্থান লাভ করতে পারব।”

এই প্রবন্ধে যে প্রাচীনকালের উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। মহম্মদ ঘোরির কাছে পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হওয়ার পর দিল্লী ও আজমির মুসলমান শাসনাধীন হয়। পৃথ্বীরাজ প্রথম যুদ্ধে জয়ী হয়ে মহম্মদ ঘোরিকে হত্যা করেননি। কিন্তু পরের বছরই (১১৯২) ঘোরি পরাজিত পৃথ্বীরাজকে হত্যা করেছিলেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলমান শাসকরা ভারত শাসক হিসাবে নিজেদের ঘোষণা করে।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে হিন্দু প্রতিভারই বিকাশ ঘটেছে। বিদেশ থেকে এসে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের প্রতিভার কোনো লক্ষণ বা বিদ্যাবত্তার কোনো খবর ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

ফলে নির্বিবাদে বলা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু প্রতিভারই বিকাশ নানাদিক দিয়ে হয়েছিল। এবং অন্যত্র তার প্রভাব পড়েছিল।

পৃথিবীর আর কোনো দেশে ওই সময়কালে, ব্যাস, বাল্মীকির মতো মহাকবি; কালিদাস, ভবভূতির মতো কবি; শূদ্রকের মতো নাট্যকার; বিষ্ণুশর্মার মতো গল্পলেখক; যাজ্ঞবল্ক, গৌতম, শঙ্করের মতো দার্শনিক; পিঙ্গলের মতো ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ; আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মতো জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ; চরক ও সুশ্রুতের মতো চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ; কৌটিল্যের মতো অর্থশাস্ত্রকার ও নাগার্জুনের মতো রাসায়নিক জন্মগ্রহণ করেছেন? কোন দেশের মহিলা মৈত্রেয়ীর মতো বলতে পেরেছিলেন— যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্? —যার দ্বারা অমৃতলাভ হয় না, তাতে আমার কী প্রয়োজন? কোন দেশের মানুষ উপনিষদ-এর ঋষির মতো উদাত্তকণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন— মানুষ মাত্রেই অমৃতের পুত্র? কোন দেশ উপলব্ধি করেছে— বসুধৈব কুটুম্বকম্— সারা বিশ্ব আমার আত্মীয়? কোন দেশের রাজপুত্র সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, শিশুপুত্র ও রাজসিংহাসন ত্যাগ করে বোধিসত্ত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন? কোন দেশের রাজা তার প্রজাবর্গকে বলতে পেরেছিলেন যে— যদি আমি প্রজাদের উপর অত্যাচার করি তাহলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার যাবতীয় সুকর্মের ফল থেকে আমি যেন বঞ্চিত হই।

কোন দেশের ধর্মশাস্ত্র একথা বলে যে, মানুষ রুচির বিভিন্নতা বশত ভিন্ন ভিন্ন পথ (সরল ও কুটিল) অবলম্বন করে কিন্তু সকলেরই একমাত্র গন্তব্যস্থল— ঈশ্বর। যেমন বিভিন্ন পথগামী নদী সকলের একমাত্র গন্তব্যস্থল সমুদ্র? কোন দেশের ধর্মগুরু শিষ্যকে এমন উপদেশ দিয়েছিল— ‘যানি অনবদ্যানি কর্মানি তানি সেবিতব্যানি ন ইতরানি— যা আনন্দিত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম তাই কর, অন্য কিছু নয়? কোন দেশে এমন সাহসী লোক আছেন যিনি বলতে পারেন--- ত্রয়োবেদস্য কর্তারাঃ ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরাঃ— বেদের তিন কর্তা ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর?

আজকাল যেমন লোক, শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভের জন্য ইউরোপ, আমেরিকায় যায়, এক সময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্ররা ভারতবর্ষে আসতেন।

ভারতের গৌরব কাহিনি আমরা জানি

না। ইসলাম ও খৃষ্টানদের শাসনে দীর্ঘ এক হাজার বছর থাকাকালে আমাদের দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেল— ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরাধিকারীরা ভারতীয়তায় লজ্জাবোধ করছে। হীনমন্যতা এমনই গ্রাস করেছে যে, তাদের ভাষা, তাদের পোশাক, তাদের খাদ্যাভাস, তাদের আইন, তাদের শাসন প্রণালী, তাদের শিষ্টাচার— তাদের সব কিছুকেই আমরা গ্রহণ করছি এবং নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি।

এহেন পরিস্থিতিতে একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। বইটি দমদম জেলে বসে লিখতে শুরু করেছিলেন বাংলা ১৩৪০ (ইং ১৯৩৩) সালে। প্রায় এক বছর পরে জেল থেকে মুক্ত হয়ে আবার দেশের কাজে নেমে পড়েন। ১০ বছর পরে বাংলা ১৩৫০ (ইং ১৯৪৩) সালে আমেদলার ফোর্টে বন্দী থাকার সময় আবার পুস্তকটির কাজে হাত দেন। ১৩৫১ সালে (ইং ১৯৪৪) বইটি সমাপ্ত করেন এবং পরে প্রকাশিত হয়। কেন এই বইটি তিনি লিখেছেন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন,

''একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গুণে, গরিমায়, অর্থ সম্পদে ও কর্মক্ষমতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। এর ফলে স্বাধীন চিন্তা এবং অশেষ বাধা সত্ত্বেও চিন্তানুগামী কর্ম করার ক্ষমতা ছিল। আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রত্যেক কর্ম অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ না করে তাদের স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি ও কর্মক্ষমতার অনুকরণ করি, তাহলে আমরাও পুনরায় জগতে গরিমাময় স্থান লাভ করতে পারব। স্বাধীন চিন্তা করে যদি দেশের ও সমাজের কল্যাণের জন্য অনেক বিষয়ে তাদের অবলম্বিত পথ ছেড়ে অন্যপক্ষও ধরি, তবু তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হবে— এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই উদারতা ও মহত্ব আমাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিমজ্জায়, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রতি রক্তবিন্দুতে সঞ্জীবীত হোক— এই পুস্তক লিখতে গিয়ে এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

প্রায় ৭০-৭২ বছর আগে প্রয়াত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ যা লিখেছিলেন— তা ঐতিহাসিক ও বাস্তব সত্য বিষয়ে এখনও আমাদের পাঠ্য। কিন্তু তিনি যে আশা নিয়ে পুস্তকটি রচনা করেছিলেন তা বাস্তব করার দায় এবং দায়িত্ব আমাদের উপর পড়েছিল। আমরা কতটা করেছি বা পেরেছি তা আত্মজিজ্ঞাসা করেই জানতে হবে।

স্বস্তিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধ আমার লেখা নয়। প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যা লিখেছিলেন আমি তাই-ই পুনরুল্লেখ করছি মাত্র।

প্রকাশক সংস্থা— মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৬। ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে পুস্তকটি নিঃশেষিত, পুনর্মুদ্রণ না হলে লভ্য নয়। এতদিন অপেক্ষা না করে ভাবলাম, ভারতের এই গৌরবগাথা স্বস্তিকার পাঠকদের সামনে অন্তত রাখি। তাঁদের মাধ্যমে আরও অনেকের কাছেই এই সত্য পৌঁছতে পারে। তবে আমার লক্ষ্য আধুনিক প্রজন্মের কাছে পৌঁছনো।

সংগ্রাহক : অমলেশ মিশ্র

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

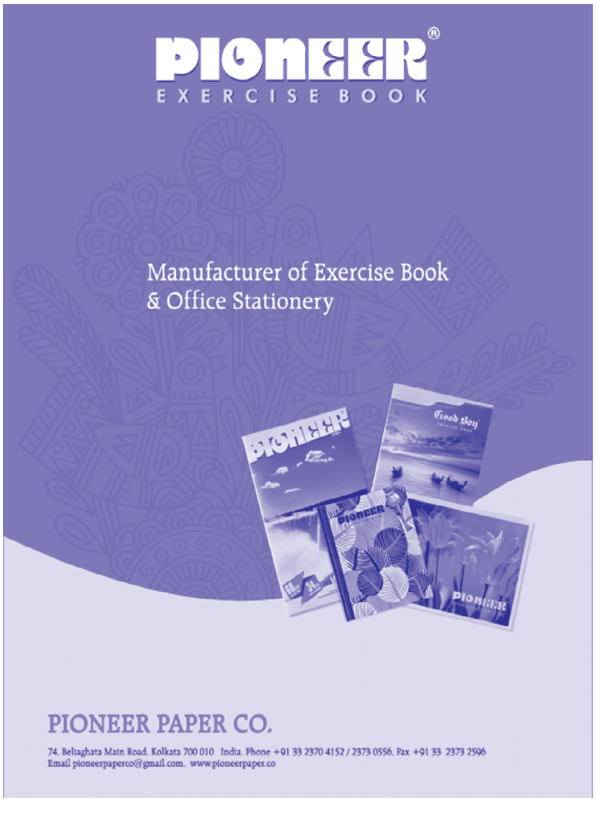

‘শ্রদ্ধা’র ৫৬ তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৭ জুলাই ৮৫ বৎসর বয়স্ক কিন্তু নবযুবক, স্বভাব সাংবাদিক শ্যামল রঞ্জন রায়কে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয় সিউড়ীর পাইকপাড়াস্থিত তাঁর জামাতার ভদ্রাসনে।

শ্রীরায় মহাশয়ের পাঁচখানি সাইকেল জেলার বিভিন্ন স্থানে রাখা থাকে। সেখান থেকে, এই বয়সে সাইকেলে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে মানুষের সুবিধা- অসুবিধা জেনে নিয়ে তিনি তা জেলার বা রাজ্যের পত্রপত্রিকায় সংবাদরূপে প্রকাশিত করেন। তিনি এখনও তার প্রতিবাদী প্রতিবেদন লিখে মানবিক চেতনা জাগ্রত করে চলেছেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তিনবার ‘ওঙ্কার ধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে সূচনা করা হয়। দীপ প্রজ্বলন করেন শ্রদ্ধার প্রবীণতম অনুদানী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন সরস্বতী শিশু মন্দির জেলা সমিতির সভাপতি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন জেলা সভাপতি শক্তিকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীরায় মহাশয়কে অর্ঘ্যস্বরূপ গীতা, বস্ত্র, উত্তরীয়, কলম, ফল, মিষ্টান্ন প্রদান করা হয়। শ্রদ্ধার পক্ষে প্রাস্তবিক ভাষণ দেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন প্রীতিকণা ভট্টাচার্য, কাকলী দাস, বনানী চৌধুরী ও কুহেলী রায়। সমগ্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটির সুচারুরূপে ব্যবস্থা করেন শ্রীরায় মহাশয়ের জামাতা ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পতিতপাবন বৈরাগ্য। পরিশেষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন কৃষ্ণেন্দু ঠাকুর। শান্তিমন্ত্র দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শোকসংবাদ

মালদা জেলার চাঁচলের স্বয়ংসেবক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা অসিত সাহার মাতৃদেবী মমতারানি সাহা গত ৬ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর ৪ পুত্রই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

***

মেদিনীপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের জেলা সভাপতি শিবনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ রেখে গেছেন।

কলকাতায় ‘মা সারদা সেবা ভারতী’র কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

গত ২৬ জুলাই সেবা ভারতীর উদ্যোগে কলকাতার বাগবাজার ও সংলগ্ন অঞ্চলের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী অভিন্নানন্দ মহারাজ, প্রধান অতিথি অধ্যাপিকা সোমা মিত্র, বিশেষ অতিথি ডাঃ শেখর ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সেবা ভারতীর সভাপতি অমর সিংহ, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট সঞ্জয় ঘোষ ও সহ-সম্পাদক শৈলেন পাল। সন্তানদের পড়াশোনার জন্য মায়েদের কষ্ট ও স্বার্থত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রত্যেক মাকে একটি মা সারদার স্মারক দেওয়া হয়। স্বামী অভিন্নানন্দ মহারাজ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সঙ্গে দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনাথ মণ্ডল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেবা ভারতীর সদস্যা পূজা রায়, মৌপর্ণা মণ্ডল ও সেবা প্রমুখ জয়ন্ত সেন।

সংস্কৃতভারতীর আবাসীয় প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১৫ থেকে ২৬ জুলাই উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরের শ্রীশ্রী নিগমানন্দ মঠে সংস্কৃত ভারতীর আবাসীয় প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৮ জন পুরুষ ও ৩২ জন মহিলা ছিলেন। শিবির উদ্বোধনে মঠের সন্ন্যাসী বিমলানন্দ মহারাজ আশীর্বচন প্রদান করেন এবং ইগনু'র প্রাক্তন নির্দেশক ড. সুজিত ঘোষ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দিনেশ কামত, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বেদতত্ত্বানন্দ, কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের পশ্চিমবঙ্গের সংযোজক তন্ময় ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাকেশ দাস, বিজ্ঞান ভারতীর অধ্যাপক নির্মল মাইতি প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও আশীর্বচন প্রদান করেন বিমলানন্দ মহারাজ এবং বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সদস্য সত্যনারায়ণ।

সোনারপুরে সেবা ভারতীর বন্যাত্রাণ

সোনারপুর বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মাছ চাষ ও খালের ধারে বসতি জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দিকে স্লুইস গেট বন্ধ রাখা এবং বর্তমানে বিদ্যাধরি নদীর জল বাড়া ওই বন্যা পরিস্থিতির কারণ।

সেবা ভারতী ও সমাজসেবা ভারতীর উদ্যোগে পাঁচদিন রান্না করা খাবার বন্যাদুর্গতদের পরিবেশন করা হয়। প্রায় ৯০০ পরিবারকে সাহায্য করা হয়।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের সারদা নগর (বেলগাছিয়া) সহ-সম্পর্ক প্রমুখ অতুল মালাকার গত ৬ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি মা, বাবা, ৩ ভাই ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা রেখে গেছেন।

বিশিষ্ট সমাজসেবী সজ্জনকুমার তুলসীয়ানের ৬৫তম জন্মতিথি উদযাপন

গত ২ আগস্ট বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা প্রবীণ আয়কর উপদেষ্টা (সিএ) সজ্জনকুমার তুলসীয়ানের ৬৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় এবং রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। শ্রীতুলসীয়ানের বাড়িতে আত্মীয়বন্ধুদের উপস্থিতিতে তাঁকে শাল পরিয়ে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেন কুমারসভার মার্গদর্শক যুগলকিশোর জৈথলিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাবীর বাজাজ, ভগীরথ চান্দক, রুগলাল সুরাণা, অরুণ মল্লাবত প্রমুখ।

১৪২২
যাত্রা জগতের হালহকিকত

বিকাশ ভট্টাচার্য

শুভ রথযাত্রায় যাত্রাজগতের এ বছরের পথচলা শুরু হলো। বিভিন্ন যাত্রাদল নতুনবছরে তাদের বিভিন্ন পালার খবরাখবর জানিয়ে চিৎপুরের গদিঘরে যাত্রামোদী সকল নায়েক বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যদিও বুকিং-য়ের অবস্থা খুব একটা আশাপ্রদ নয়। গ্রামবাংলায় এখন যেভাবে তৃণমূল-পুলিশের দাপট চলছে— তাতে স্থানীয় অর্গানাইজাররা খুব বিরাট অঙ্কের রিস্ক নিতে আগ্রহী নন। স্বভাবতই যাত্রাদলগুলিও বিভিন্ন বাজেটের তিন চারটে পালা একসঙ্গে প্রস্তুত করছে। একই স্বত্বাধিকারী তিন-চারটে কোম্পানির নামে পালা প্রস্তুত করছে।

একসময় সিনেমা-থিয়েটার জগতের

নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে বিগ বাজাটের তিন চারটে পালা একসঙ্গে প্রস্তুত করছে। একই স্বত্বাধিকারী তিন-চারটে কোম্পানীর নামে পালা প্রস্তুত করছে।

একসময় সিনেমা-থিয়েটার জগতের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে বিগ বাজেটের বহু পালা হয়েছে। উৎপল দত্ত, অজিতেশ, রমাপ্রসাদ-রা যেমন এসেছেন তেমনই তাপস পাল, শতাব্দী, অভিষেক'রাও এসেছেন। এখন সেই ঝোঁকটা কমেছে। তবুও দুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নাট্য কোম্পানীতে নীলকমল চট্টোপাধ্যায় রচিত, নির্দেশিত ও অভিনীতি 'অগ্নিগর্ভ বাংলায় রংবাজ বৌমা' পালায় এবার চলচ্চিত্র জগতের একসময়ের নায়িকা পাপিয়া অধিকারীকে দেখা যাবে। এদেরই তপোবন নাট্য কোম্পানী একসঙ্গে 'কাশীধামে দেবীবরণ', 'সানাই' ও 'বিসর্জন' তিনটে পালা নামাচ্ছে। এতে দেখা যাবে যাত্রাজগতে খুব পরিচিত মুখ বিদিশা মহান্তীকে। যাত্রাজগতে নিজেদের অভিনয় প্রতিভায় কাকলী চৌধুরী ও অনাথ চক্রবর্তী জুটি নিজেদের জায়গা পোক্ত করে নিয়েছেন। সত্যনারায়ণ অপেরার 'আলো আমার আলো' পালায় এদের দেখা যাবে। পালা লেখা, নির্দেশনা— সবটাই এরা দেখছেন। সুর দিয়েছেন যাত্রাজগতের পরিচিত মুখ স্বপন পাকড়াশী।

যাত্রাজগতে স্বত্বাধিকারী জি. নন্দী ও অঞ্জলি নন্দীর নামডাক আছে। নন্দী কোম্পানী, দি নিউ অগ্রগামী ও স্বর্ণাঞ্জলি অপেরার হয়ে তিনটি পালা এরা নামাচ্ছেন। নন্দী কোম্পানীর তুরূপের তাস স্বনামধন্য শ্যামল চক্রবর্তী রচিত, নির্দেশিত ও অভিনীত 'জনতার আদালতে ভগবানের বিচার'। এছাড়া বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিছুটা চেনামুখ মিতালী চক্রবর্তী নিউ অগ্রগামীর ব্যানারে নিজেরই লেখা ও পরিচালনায় 'সখী তুমি কার'। এছাড়া স্বর্ণাঞ্জলি অপেরার নামে পালা নামছে 'চোখ তুলে দেখ না এসেছে। কম বাজেটের এই পালায় কোনো গ্লামার আর্টিস্ট না থাকলেও এদের দাবি এ পালা যাত্রামোদী দর্শকদের আকৃষ্ট করবেই।

বাংলা যাত্রা জগতে প্রযোজক তাপস দাস দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। নিউ দেবাঞ্জলি অপেরার ব্যানারে তার এবছরের এক নফর পালা মঞ্জিল ব্যানার্জীর 'ডিসকো ডান্সার'। অভিরাজ, মেঘনা হালদারের সঙ্গে আছেন সুব্রত যিনি সংস্কার ভারতীতে অভিনয়ের পাঠ নিয়েছেন। গত বছরেও সংস্কার ভারতীর 'কারাগার' নাটকে চন্দনার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। ডিসকো ডান্সারের আরেকটা আকর্ষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত কেরিওগ্রাফার দেবরূপ-ঋতুপর্ণার ডান্সট্রুপের নাচ। দাসবাবুর আরেকটা দল মা তারা অপেরা নিয়ে আসছে 'নিশুতি রাতের হায়না'। বাংলা সিনেমার পরিচিত মুখ সুমিত গাঙ্গুলী এই পালার ভিলেন।

যাত্রাজগতের পরিচিত পালাকার মঞ্জিল ব্যানার্জী এবং নির্দেশক শ্যামল চক্রবর্তী সঙ্গীতা এন্টারপ্রাইজেও নাম লিখিয়েছেন। শ্যামল চক্রবর্তী অন্য দলে অভিনয় করলেও সঙ্গীতার স্বর্ণদীপ অপেরার ব্যানারে ভক্তিমূলক পালা 'সাধক রামপ্রসাদ' পালার নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, চিৎপুরের আরও বেশকিছু দলের খবরাখবর আছে। আছে নট্ট কোম্পানীর খবর। বারান্তরে তা জানানোর ইচ্ছে রইল।

শব্দরূপ-৭৫৯ ডা: শান্তনু গুড়িয়া

১	■	■	২		৩		■
	■	■		■		■	■
৪	৫			■		■	■
■		■	■	৬		৭	■
■	৮	৯		■	■		■
■	■		■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	■	

সূত্র :

পাশাপাশি : **২.** ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তক গৌতম ঋষি, **৪.** পুরাণোক্ত পাতাল বিশেষ, **৬.** মনস্তাপ, দুঃখ, **৮.** কুকর্মে সহযোগ, **১০.** আকাশ; পুরাণোক্ত দেশ বিশেষ, **১২.** উত্তর রামচরিত রচয়িতা বিখ্যাত সংস্কৃত কবি।

উপর-নীচ : **১.** যার চ্যুতি বা পরিবর্তন নেই; কৃষ্ণ, বিষ্ণু, **২.** 'আছ—অনীলে চিরণভোনীলে'; অগ্নি, **৩.** জমিদারের অধীনে বাস করে যে রায়ত অন্য জমিদারের' অধীত জমি চাষ করে, **৫.** লোলুপতা, লোভ, লিপ্সা, **৭.** দোকানদার, বিক্রেতা, **৯.** 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি, **১০.** দক্ষকন্যা বিশেষ, দেবমাতা, কাশ্যপপত্নী, **১১.** চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় জাতি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫৬
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম

ফু	■	■	প	দ্ম	ফু	ল	■
ল্ল	■	■	র্যা	■	ৎ	■	■
রা	জ	সূ	য়	■	কা	■	■
■	ন	■	■	উ	র	গ	■
■	ম	রা	ল	■	■	র	■
■	■	ধা	■	প	দ্মা	ব	তী
■	■	প	■	ত্ত	■	■	ব
■	প	দ্ম	যো	নি	■	■	র

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৫৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ৩১

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু অত্যাচারের বিরুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের ওপর ক্রমাগত নির্যাতনের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতিনিধি সভায় সোচ্চার হলেন একমাত্র হিন্দু প্রতিনিধি তুলসী গাবার্ড। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জঙ্গি কার্যকলাপ ও সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের বিরোধিতা করে শ্রীগাবার্ড প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবে তিনি বাংলাদেশকে এক অস্থির দেশ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, ওই দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ, বিশেষ করে গত বছর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। তিনি দাবি জানান, বাংলাদেশে হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের ওপর যারা অত্যাচার করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ও অত্যাচারিতদের রক্ষা করার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের।

শ্রীগাবার্ডের প্রস্তাবকে দুই প্রতিনিধি বব ভনড্ ও মার্টিন সার্লমন সমর্থন জানিয়ে বলেন, এই প্রস্তাবের ফলে বাংলাদেশ সরকার সেদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিয়ে সচেষ্ট হবেন।

রামজন্মভূমি পরিসরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অর্থ মঞ্জুর করছে অখিলেশ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অযোধ্যায় রামজন্মভূমি পরিসরের সুযোগ- সুবিধার উন্নতি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এক বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছে উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদব সরকার। এতে মুসলমানদের বিশেষত যারা মামলা করেছে তাদের অত্যন্ত গোসা হয়েছে।

তাদের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় যে স্থিতাবস্থার আদেশ দিয়েছে এর ফলে তা লঙ্ঘিত হবে এবং সেইসঙ্গে মুসলমানদের মনে আঘাত দেওয়া হবে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকার ওই পরিসরের ব্যারিকডগুলির পুনর্নির্মাণ, পরিকাঠামোগত উন্নতি এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কিছু অস্থায়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায় ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। গত ৮ জুলাই এই মর্মে সরকারের থেকে দুটি আলাদা বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুলিশ বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ এক আধিকারিক সরকারের এই প্রস্তাবিত সংস্কারের কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে। ২০১৬-র মার্চের মধ্যে এই প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ভারতের প্রথম সংস্কৃত টিভি চ্যানেল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতে এই প্রথম শুরু হতে চলেছে সংস্কৃত টিভি চ্যানেল। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াতের পক্ষ থেকে এই চ্যানেল সম্প্রসারণের ছাড়পত্র মিলেছে। হরিদ্বার জেলার রানিপুরের এক সংস্কৃত অ্যাকাডেমি চ্যানেলটির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে। তারা এই চ্যানেলের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতে সংবাদ সম্প্রচার করবে। একসময় দূরদর্শন চ্যানেলে সংস্কৃত সংবাদ পাঠ করা হোত। তবে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আবার তা চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ। শুধু এই দেশেই নয়, প্রাচীন এই ভাষার গুরুত্ব বুঝেছে সুদূর জার্মানিও। সে দেশেও সংস্কৃত ভাষায় সংবাদ পাঠ হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতে সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় একটি চ্যানেল এই প্রথম। চ্যানেলটিতে প্রায় ১০০ জন সংস্কৃত পণ্ডিত যেমন থাকবেন, তেমনি বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং উপাচার্যদেরও দেখা মিলবে। সংস্কৃত অ্যাকাডেমির ভাইস-চেয়ারম্যান কৃষ্ণ সেমওয়াল জানান, এই সমস্ত বিদ্বজ্জনদের নিয়ে একটি বৈঠকেরও আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে চ্যানেলের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। অ্যাকাডেমির সম্পাদক সুরেশ চরণ বহুগুণা বলেন, ২০১৪-১৫ বর্ষে কেন্দ্র সরকারের কাছে সংস্কৃত ভাষায় চ্যানেল তৈরির প্রস্তাব সহ বেশ কিছু প্রস্তাব পাঠানো হয়। তবে সংস্কৃত অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে এই ধরনের একটি পরিকল্পনা তৈরিই ছিল। আর সেই পরিকল্পনা মাফিক অন্যান্য রাজ্য সরকারের দপ্তরেও প্রস্তাব পাঠানো হয়। যাতে তাদের দিক থেকেও অ্যাকাডেমি সাহায্য পেতে পারে।

বাঘা যতীন— আত্মনিবেদনের শতবর্ষ

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচিত হয়েছিলেন বাঘ মেরে, বাঘা যতীন নামে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাঘা যতীন-এর মুখঃনিঃসৃত 'আমরা মরব, দেশ জাগবে'-র মতো বাণীর সার্থক প্রতিফলন খুব কমই দেখা গিয়েছে। ১৯১৫ সালে বুড়িবালামের তীরে সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের শহীদ বাঘা যতীন-এর আত্মবলিদানের শতবর্ষ পূর্তির মাহেন্দ্রক্ষণ এবছরই। সেই উপলক্ষে আমাদের বিশেষ সংখ্যা। লিখেছেন— চন্দ্রমৌলী উপাধ্যায়, অভিরূপ নাগচৌধুরী প্রমুখ। থাকবে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও ছবি। সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা। সত্বর কপি বুক করুন

প্রকাশিত হবে ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৫

SURYA
Energising Lifestyles
Wide beam angle for better light spread
WHY SURYA LED?
The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of
Eco Friendly
Instant Lighting
Low Maintenance
High Energy Efficiency
High Power Factor
Lasts upto 25000 hrs
Wide Operating Voltage Range*
WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS
SURYA LED
5W MRP ₹350/-
www.surya.co.in
lighting
fans
appliances
pipes
*voltage range 100V - 300V
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!